সূচিপত্র

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৯ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
এপ্রিল-২০২৬

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية النطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এপ্রিল ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৪.২৬	০৪: ৩২	১২:০৩	০৩: ৩০	০৬:১৫	০৭:৩১	১৬.০৪.২৬	০৪: ১৮	১১:৫৯	০৩: ২৬	০৬: ২১	০৭:৩৯
০২.০৪.২৬	০৪: ৩১	১২:০২	০৩: ৩০	০৬:১৫	০৭:৩২	১৭.০৪.২৬	০৪: ১৭	১১:৫৮	০৩: ২৬	০৬: ২১	০৭:৪০
০৩.০৪.২৬	০৪:৩০	১২:০২	০৩: ২৯	০৬:১৫	০৭:৩২	১৮.০৪.২৬	০৪: ১৬	১১:৫৮	০৩: ২৫	০৬: ২২	০৭:৪০
০৪.০৪.২৬	০৪: ২৯	১২:০২	০৩: ২৯	০৬:১৬	০৭:৩৩	১৯.০৪.২৬	০৪: ১৫	১১:৫৮	০৩: ২৫	০৬: ২২	০৭:৪১
০৫.০৪.২৬	০৪: ২৮	১২:০১	০৩: ২৯	০৬:১৬	০৭:৩৩	২০.০৪.২৬	০৪: ১৪	১১:৫৮	০৩: ২৫	০৬: ২২	০৭:৪১
০৬.০৪.২৬	০৪: ২৭	১২:০১	০৩: ২৯	০৬:১৭	০৭:৩৪	২১.০৪.২৬	০৪: ১৩	১১:৫৭	০৩: ২৪	০৬: ২৩	০৭:৪২
০৭.০৪.২৬	০৪: ২৬	১২:০১	০৩: ২৮	০৬:১৭	০৭:৩৪	২২.০৪.২৬	০৪: ১২	১১:৫০	০৩: ২৪	০৬: ২৩	০৭:৪৩
০৮.০৪.২৬	০৪: ২৫	১২:০১	০৩: ২৮	০৬:১৮	০৭:৩৫	২৩.০৪.২৬	০৪: ১১	১১:৫৭	০৩: ২৪	০৬: ২৪	০৭:৪৩
০৯.০৪.২৬	০৪: ২৪	১২:০০	০৩: ২৮	০৬:১৮	০৭:৩৫	২৪.০৪.২৬	০৪:১০	১১:৫৭	০৩: ২৪	০৬: ২৪	০৭:৪৪
১০.০৪.২৬	০৪: ২৩	১২:০০	০৩: ২৮	০৬:১৯	০৭:৩৬	২৫.০৪.২৬	০৪:০৯	১১:৫৭	০৩: ২৩	০৬: ২৫	০৭:৪৪
১১.০৪.২৬	০৪: ২৩	১২:০০	০৩: ২৭	০৬: ১৯	০৭:৩৬	২৬.০৪.২৬	০৪:০৮	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬: ২৫	০৭:৪৪
১২.০৪.২৬	০৪: ২২	১২:০০	০৩: ২৭	০৬:১৯	০৭:৩৭	২৭.০৪.২৬	০৪:০৭	১১:৫৬	০৩: ২৩	০৬: ২৫	০৭:৪৬
১৩.০৪.২৬	০৪: ২১	১২:৫৯	০৩: ২৭	০৬: ১৯	০৭:৩৭	২৮.০৪.২৬	০৪:০৬	১১:৫৬	০৩: ২২	০৬: ২৬	০৭:৪৬
১৪.০৪.২৬	০৪: ২০	১১:৫৯	০৩: ২৭	০৬: ২০	০৭:৩৮	২৯.০৪.২৬	০৪:০৫	১১:৫৬	০৩: ২২	০৬: ২৬	০৭:৪৭
১৫.০৪.২৬	০৪: ১৯	১১:৫৯	০৩: ২৬	০৬: ২০	০৭:৩৮	৩০.০৪.২৬	০৪:০৪	১১:৫৬	০৩: ২২	০৬: ২৭	০৭:৪৮

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৬ ঈসায়ী

শাওয়াল-জিলক্বদ ১৪৪৭ হিজরী

চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩২-৩৩ বাংলা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম

প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন

শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী

প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান

মো: জামাল হোসেন

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১

ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬

মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ

বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
তর্জুমানুল হাদীস
রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ৯৮ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠

الهاتف : ٢٢٤٤٥٨٥٥١-٨٨٠٢+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،

المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،

رئيس التحرير: أ/محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসার কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
❖ স্পেন ট্র্যাজেডি ও এপ্রিল ফুল : মুসলিমদের জন্য এক ধোঁকা ও বেদনাবিধুর স্মৃতি।..... ৩

দারসুল কুরআন
❖ দ্বীনের ওপর আমরণ অটল থাকাই সফল্য লাভের একমাত্র উপায়।..... ৫
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

দারসুল হাদীস
❖ নারী পরুষ সকলের ওপরে আল্লাহর ইবাদতে অবিচল থাকা অপরিহার্য.....৮
শাইখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী

প্রবন্ধ :
❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র.....১১
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
❖ সালাফ চরিত।.....১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন? ।.....১৫
ড. রেজাউল করিম মাদানী
❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।.....২০
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ অবাক হলেও সত্য প্রতি হাজারে মাত্র একজন যাবে জান্নাতে।.....২৩
অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের
❖ বিদায়ী রামাযান : আত্মশুদ্ধির কী শিক্ষা রেখে গেল? ।.....২৫
আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ
❖ ধনী গরীব সমাচার।.....২৯
সাইদুর রহমান
❖ পহেলা বৈশাখ : বাংলার সংস্কৃতির বিকৃতি।.....৩২
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
❖ বরকতময় মাসের পরে যেমন ছিলেন বরকতময় মানুষেরা।..৩৬
মো: সুলাইমান বিন হাবিবুল্লাহ

শুব্বান পাতা
❖ বাংলা নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।.....৩৮
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম
❖ অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।.....৪১
মো. খশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আল
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।.....৪৩

সম্পাদকীয়
الافتتاحية

স্পেন ট্র্যাজেডি ও এপ্রিল ফুল : মুসলিমদের জন্য এক ধোঁকা ও বেদনাবিধুর স্মৃতি

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিছু দিন আছে, যা বাহ্যত আনন্দ, উৎসব বা বিনোদনের প্রতীক হিসেবে পরিচিত হলেও, গভীরে লুকিয়ে থাকে বেদনা, প্রতারণা ও নৈতিক অবক্ষয়ের তীব্র বার্তা। ১লা এপ্রিল–যা বিশ্বজুড়ে 'এপ্রিল ফুল' নামে পরিচিত– তেমনই একটি দিন। বহু মানুষ এ দিনটিকে হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক ও একে অপরকে ধোঁকা দেয়ার দিন হিসেবে পালন করে। কিন্তু একজন সচেতন মুসলিমের দৃষ্টিতে এটি নিছক বিনোদনের বিষয় নয়; বরং সত্য-মিথ্যা, নৈতিকতা-অনৈতিকতা, ইতিহাস-শিক্ষা এবং ঈমানি চেতনার আলোকে বিচারযোগ্য একটি বিষয়।

আজকের মুসলিম সমাজের এক বড় সংকট হলো–পশ্চিমা সংস্কৃতির অনেক কিছুই যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করে নেয়া। ফলে 'মজা', 'ফান', 'প্র্যাঙ্ক' বা 'ট্রেন্ড'-এর নামে এমন কিছু আচরণ আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে, যা ইসলামী চরিত্র, আখলাক ও সত্যবাদিতার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। 'এপ্রিল ফুল' তেমনই এক সংস্কৃতি, যার মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা এবং অন্যকে সাময়িকভাবে হলেও কষ্ট বা বিভ্রান্তিতে ফেলার প্রবণতা। প্রশ্ন হলো– যে ধর্ম সত্যবাদিতাকে ঈমানের অংশ বলে, যে ধর্ম মিথ্যাকে মুনাফিকির লক্ষণ বলে, সেই ধর্মের অনুসারী কী করে 'এপ্রিল ফুল'-এর নামে মিথ্যা ও ধোঁকাকে হাস্যরসের উপাদান বানাতে পারে?

মুসলিম সমাজে একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলো– 'এপ্রিল ফুল'-এর উৎপত্তি নাকি স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কথিত আছে, আন্দালুসে মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রিষ্টান বাহিনী মুসলিমদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, তারা নিরাপদে জাহাজে করে চলে যেতে পারবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতারণা। মুসলিমরা যখন নিরাপদে প্রস্থানের আশায় নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হলো, তখন তাদের ওপর হামলা চালানো হয়, হত্যা করা হয়, নিপীড়ন চালানো হয় এবং এ প্রতারণামূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাকি 'এপ্রিল ফুল' এর সূচনা ঘটে।

তবে সত্য কথা হলো– এ বর্ণনাটি ঐতিহাসিকভাবে শক্ত প্রমাণসমর্থিত নয়। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে 'এপ্রিল ফুল'-এর উৎপত্তি স্পেনের মুসলিম ট্র্যাজেডির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত–এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা এপ্রিলে 'ফুল' প্রথার উৎপত্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমন ক্যালেন্ডার পরিবর্তন, ঋতুভিত্তিক লোকাচার, ইউরোপীয় সামাজিক রসিকতার প্রথা ইত্যাদি।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। ঐতিহাসিক বর্ণনার সত্যতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও 'এপ্রিল ফুল'-এর কার্যবস্তু যে মিথ্যা ও প্রতারণা– এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এর উৎপত্তি স্পেনে হোক বা অন্য কোথাও হোক একজন মুসলিমের জন্য মূল প্রশ্ন হলো : 'ইসলাম কি মজা করার জন্য মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া ও অন্যকে বিভ্রান্ত করা বৈধ করেছে'? উত্তর–স্পষ্টভাবে না।

ইসলামে সত্যবাদিতা ঈমানের আলোকবর্তিকা। ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যার ভিত্তি সত্য, ন্যায়, আমানতদারি ও আখলাকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যবাদিতা শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়; এটি জান্নাতের পথ, ঈমানের আলামত এবং আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম।

কুরআনের নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" *(সূরা আত-তাওবাহ : ১১৯)*। এ আয়াত মুসলিমদের জন্য একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে– সত্যবাদীদের সঙ্গ, সত্যের পথ এবং সত্যভিত্তিক জীবন।

মিথ্যা ও প্রতারণা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর; কারণ সত্য নেকির দিকে নিয়ে যায়, আর নেকি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়... আর মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়'। *(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)*।

আরেক হাদীসে এসেছে– 'যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস'! *(সুনান আবূ দাউদ, তিরমিযী –অর্থগতভাবে প্রসিদ্ধ)*। এ হাদীস 'এপ্রিল ফুল' সংস্কৃতির ওপর সরাসরি প্রযোজ্য।

আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদীস : "যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" *(সহীহ মুসলিম)*। এটি অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী। 'ধোঁকা' ব্যবসায়, সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ– সবক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ। সুতরাং 'এপ্রিল ফুল'-এর নামে ধোঁকা দেয়া ইসলামী চরিত্রের পরিপন্থী।

মুনাফিকির লক্ষণ ও মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে'। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। যে কাজ মুনাফিকির লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, তা 'মজা' নাম দিলেই বৈধ হয়ে যায় না।

'মজা' কি সবকিছু বৈধ করে দেয়? অনেকেই যুক্তি দেন– 'এটা তো শুধু মজা'! কিন্তু ইসলামে মজারও সীমারেখা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রসিকতা করতেন, কিন্তু সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না। এখানেই মুসলিমের জন্য নীতিমালা স্পষ্ট: রসিকতা করা যাবে, কিন্তু মিথ্যা বলে নয়; হাসানো যাবে, কিন্তু কাউকে অপমান করে নয়; আনন্দ করা যাবে, কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে নয়।

আজকের 'প্র্যাঙ্ক কালচার' বা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া অনেক তথাকথিত 'মজা' আসলে মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা, মানসিক কষ্ট দেয়া, বিব্রত করা, ভয় দেখানো– যা ইসলামী আদব-আখলাকের পরিপন্থী।

এপ্রিল ফুল : মুসলিম সমাজে এর ক্ষতিকর প্রভাব। এটি মিথ্যাকে স্বাভাবিক করে তোলে, বিশ্বাস নষ্ট করে, মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করে এবং পশ্চিমা অন্ধ অনুকরণকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে এটি মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তাশাব্বুহ (অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" *(সুনান আবূ দাউদ –অর্থগতভাবে প্রসিদ্ধ)*। এ আলোকে বোঝা যায়, ইসলামের নৈতিকতার বিপরীত সংস্কৃতি অনুসরণ করা মুসলিম পরিচয়ের জন্য ক্ষতিকর।

ইসলামে বিকল্প রয়েছে। ইসলাম মানুষকে আনন্দবিমুখ করেনি; বরং শালীন, সত্যভিত্তিক আনন্দকে উৎসাহিত করেছে। তাই মুসলিমদের উচিত– সত্যভিত্তিক রসিকতা করা, কাউকে কষ্ট না দিয়ে আনন্দ করা, পরিবারে ইসলামী আখলাক শিক্ষা দেয়া এবং সমাজে সচেতনতা তৈরি করা।

১লা এপ্রিল এলে মুসলিমদের করণীয়– কাউকে ধোঁকা না দেয়া, ভুয়া খবর না ছড়ানো, সন্তানদের সতর্ক করা, বন্ধুদের ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বলা এবং সত্যবাদিতা প্রচার করা। এটি আত্মসমালোচনারও একটি দিন হতে পারে– আমি কি সত্যবাদী?

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ বিষয় হলো– 'এপ্রিল ফুল'-এর উৎপত্তি স্পেন ট্র্যাজেডির সঙ্গে যুক্ত– এটি নিশ্চিত ইতিহাস নয়। তাই এটিকে নিশ্চিত দাবি হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। তবে এতে 'এপ্রিল ফুল' বৈধ হয়ে যায় না; কারণ এর মূল আচরণ– মিথ্যা ও প্রতারণা– ইসলামে নিষিদ্ধ।

উপসংহারে বলা যায়, 'এপ্রিল ফুল' আধুনিক সমাজে একটি সাধারণ বিনোদন হিসেবে স্বীকৃত হলেও ইসলামের আলোকে এটি একটি সমস্যাজনক সংস্কৃতি। মুসলিমদের উচিত মিথ্যা ও ধোঁকা বর্জন করে সত্যবাদিতা, নৈতিকতা ও ইসলামী পরিচয় রক্ষা করা। ১লা এপ্রিলকে 'এপ্রিল ফুল' হিসেবে নয়; বরং সত্য, নৈতিকতা ও আত্মসমালোচনার দিন হিসেবে দেখা হোক– এটাই হোক সচেতন মুসলিম সমাজের প্রজ্ঞার পরিচয়।

'এপ্রিল ফুল' কেবল একটি মজার দিন নয়; এটি মিথ্যা ও প্রতারণাকে সামাজিকভাবে স্বাভাবিক করার একটি সংস্কৃতি। এর উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ থাকলেও ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা ও ধোঁকা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাই মুসলিমদের উচিত এ সংস্কৃতি বর্জন করে সত্যবাদিতা, নৈতিকতা ও ইসলামী আখলাক ধারণ করা।❑❑❑❑

দারসুল কুরআন/ مدروس القرآن

দ্বীনের ওপর আমরণ অটল থাকাই সফল্য লাভের একমাত্র উপায়

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

আল্লাহ মহিমান্বিত কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। মহান আল্লাহ, বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো?"[১]

এ আয়াত অনুসারে আসুন আমরা আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু আয়াত শুনি এবং এর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ এবং তারপর তারা অবিচল থাকে-তাদের জন্য ফেরেশতারা অবতরণ করে, একথা বলার জন্য যে, ভয় পেয়ো না এবং দুঃখ করো না, বরং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে। দুনিয়া ও পরকালে আমরা তোমাদের সঙ্গী। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে এবং তোমরা যা দাবি করবে তাই পাবে। ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে।[২]

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, এবং তারপর তারা অবিচল থাকে": এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : অর্থাৎ তারা তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করত এবং তিনি তাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করত। ইমাম যুহরি বলেন : উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিম্বরে এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন, আল্লাহর কসম, তারা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল ছিল এবং শিয়ালের মতো পথভ্রষ্ট হয়নি।

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাক্বাফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন, যা আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেন, বলো, আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করলাম। অতঃপর এর ওপর অবিচল থাকো। একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সরল পথে থাকে, যতক্ষণ তার ইচ্ছা, কাজ এবং কথা আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾

"সুতরাং তোমরা যেমন আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, তেমনি দৃঢ় থাকো এবং তোমাদের সাথে যারা আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে"।[৩] তিনি বলেছেন, যেমন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছ, এমনটা বলেননি যেমন তোমরা চাও। প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথপ্রাপ্ত সে-ই, যার অন্তর সরল এবং সরল পথে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

[১] সূরা মুহাম্মাদ আয়াত : ২৪।

[২] সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৩০-৩২।

[৩] সূরা হূদ আয়াত : ১১২।

"যে ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে চলে, সে কি উত্তম পথপ্রাপ্ত, নাকি যে সরল পথে সোজা হয়ে চলে?"।[৪]

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ "ফেরেশতারা তাদের জন্য অবতরণ করে" অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তারা বলবে, ভয় পেয়ো না, অর্থাৎ পরকালে তোমরা যা কিছুর সম্মুখীন হতে যাচ্ছো, তা নিয়ে ভয় পেয়ো না। কারণ পরকালে রয়েছে ভয়াবহ সব ভয়, যার শুরু কবর থেকে, যা পরকালের প্রথম পর্যায়। সেখানে রয়েছে কবর, তার অন্ধকার, সংকীর্ণতা এবং নির্জনতা, শিঙ্গার ধ্বনি; কিয়ামতের ময়দান, পুলসিরাত এবং দাঁড়িপাল্লা। আল্লাহ এসব ভয়কে সরল বিশ্বাসীদের জন্য সহজ করে দিবেন।

وَلَا تَحْزَنُوا "এবং দুঃখ করো না" এর অর্থ হলো, পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে যা কিছু তোমরা পেছনে ফেলে এসেছো, যেমন সন্তান, পরিবার, সম্পদ এবং ধর্ম, তা নিয়ে দুঃখ করো না, কারণ আমিই তোমাদের জন্য সেগুলোর যত্ন নিবো।

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ "এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে।" তাদেরকে মন্দের অপসারণ এবং ভালোর প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : "ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেন। যদি মৃত ব্যক্তি একজন নেককার ব্যক্তি হন, তবে তারা বলেন, বেরিয়ে এসো, হে উত্তম দেহে থাকা উত্তম আত্মা। শান্তির সাথে বেরিয়ে এসো এবং স্বস্তি ও সুগন্ধের সুসংবাদ গ্রহণ করো, আর এমন এক প্রভুর সুসংবাদ গ্রহণ করো, যিনি তোমাদের প্রতি রাগান্বিত নন।

ইবনে আবি হাতিম তাঁর সনদে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সূরা ফুসসিলাত পাঠ করতে করতে এই পর্যন্ত পৌঁছালেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ অতঃপর তারা এর ওপর অবিচল থাকে- ফেরেশতারা তাদের জন্য অবতরণ করে।" তারপর তিনি থামলেন এবং বললেন, আমাদের বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ কোনো মুমিন বান্দাকে তার কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন এ দুনিয়ায় তার সাথে থাকা দু'জন ফেরেশতা তার সাথে দেখা করবে এবং তাকে বলবে, ভয় পেয়ো না, দুঃখও করো না। সুতরাং আল্লাহ তাকে তার ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করবেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিবেন।

ইবনে মাসউদ বলেন, যখন মৃত্যুর ফেরেশতা কোনো মুমিনের রূহ নিতে আসে, তখন সে তাকে বলে, তোমার রব তোমার জন্য সালাম পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে বলে, হে আল্লাহর বন্ধু, তোমার ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ তোমার জন্য সালাম পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি পাঠ করলেন,

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"যাদেরকে ফেরেশতারা পবিত্র ও সৎ থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটায় এই বলে, তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।"[৫] যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, তারা তাকে তার মৃত্যুর সময়, তার কবরে এবং যখন সে পুনরুত্থিত হবে, তখন সুসংবাদ দেয়। ইমাম ইবনে কাসির বলেন, এ উক্তিটি অন্য সকল উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি খুবই ভালো।

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ "আমরা এই দুনিয়াতে এবং পরকালে তোমাদের মিত্র" অর্থাৎ ফেরেশতারা মুমিনদেরকে মৃত্যুর সময় বলে, আমরা দুনিয়াতে তোমাদের মিত্র ছিলাম, অর্থাৎ এই দুনিয়াতে তোমাদের সঙ্গী ছিলাম, আমরা তোমাদেরকে পথ দেখাতাম এবং আল্লাহর আদেশে তোমাদের রক্ষা করতাম। একইভাবে আমরা পরকালে তোমাদের সাথে থাকবো কবরের নির্জনতায় এবং শিঙ্গার ধ্বনিতে তোমাদের সান্ত্বনা দিবো। আমরা তোমাদেরকে

[৪] সূরা আল-মুলক আয়াত : ২২।

[৫] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৩২।

পুনরুত্থান ও সমাবেশের দিনে সুরক্ষিত রাখবো, সরল পথে পথ দেখাবো এবং জান্নাতে নিয়ে যাবো।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ "এবং সেখানে তোমরা পাবে তাই, যা তোমাদের মন আকাঙ্ক্ষা করবে এবং সেখানে তোমরা পাবে তাই, যা তোমরা দাবি করবে।" অর্থাৎ জান্নাতে মনের আকাঙ্ক্ষিত এবং দৃষ্টিনন্দন বস্তু থেকে তোমরা যা কিছু বেছে নেবে, তার সবই পাবে ও তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী তা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ "ক্ষমাশীল, দয়ালু সত্তার পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা" অর্থাৎ এ আতিথেয়তা ও উপহার সেই সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি তোমার পাপ ক্ষমা করেন, যিনি পরম করুণাময়। অর্থাৎ যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন ও পাপ গোপন রাখেন এবং যিনি দয়ালু ও করুণাময়। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের মন কল্পনাও করতে পারেনি। তুমি চাইলে পড়তে পারো,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"কোনো মানুষই জানে না যে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ চক্ষু শীতলকারী গোপন রাখা হয়েছে"।[৬]

এই মহৎ আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে :

১-ঈমান ও নেক আমল জান্নাতে প্রবেশের দুটি কারণ।

২-ফেরেশতারা মুমিনকে মৃত্যুর সময়, কবরে, পুনরুত্থানের দিনে এবং জান্নাতের দরজায় সুসংবাদ দিবে।

৩- আমলকারীকে তার প্রাপ্য পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া উচিত। কারণ এটি তাকে অনুপ্রাণিত করতে অধিক কার্যকর। আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।[৭]

৪. মুমিনরা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের কর্মের দ্বারা নয়। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন :

سدِّدوا وقارِبوا وأبشِروا، فإنه لا يُدخل أحدًا الجَنَّة عملُه قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني الله بمغفرة ورحمة.

"তোমরা সঠিক আমলের জন্য চেষ্টা করো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সুখবর গ্রহণ করো। কারণ কেউ কেবল তার কর্মের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা জিজ্ঞাসা করলো, এমনকি আপনিও নন, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি উত্তর দিলেন, এমনকি আমিও নই, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা ও করুণা দ্বারা আবৃত করেন।[৮]

৫. মুমিনরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত এবং দৃষ্টিনন্দন সবকিছু দেয়া হবে। এমনকি তার চেয়েও বেশি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেখানে তারা যা ইচ্ছা তাই পাবে এবং আমার কাছে আরো বেশি আছে।"[৯] এবং তিনি আরো বলেন, "যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার এবং তার চেয়েও বেশি।"[১০]

> আবূল ইয়ামান হাকাম ইবনু নাফি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নবী (ﷺ) এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মুসলিম ব্যাক্তির উপর যে সকল বিপদ আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।

[৬] সূরা আস-সাজদাহ আয়াত : ১৭।

[৭] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২২৩।
[৮] সহীহ বুখারী হা : ৬৪৬৭।
[৯] সূরা কাফ আয়াত : ৩৫।
[১০] সূরা ইউনুস আয়াত : ২৬।

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

নারী পুরুষ সকলের ওপরে আল্লাহর ইবাদতে অবিচল থাকা অপরিহার্য

শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু মালিক। সালাত সালাম বর্ষিত হোক তার প্রিয় রাসূল, তার পরিবার ও তার সকল সাথীর ওপর। প্রিয় পাঠক! আমি আজকে দারসুল হাদীসের জন্য নিম্নের হাদীসটি নির্বাচন করেছি। প্রথমত হাদীসটির সরল অনুবাদ পেশ করব। পরবর্তীতে এ হাদীসটি কোন কোন হাদীস বিশারদ বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করব এবং এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করব। তারপর এর সমার্থবোধক হাদীসগুলো এখানে বর্ণনা করব, তারপর হাদীস থেকে প্রমাণিত মাসআলা-মাসায়েল উল্লেখ করব। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য কামনা করছি।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ -الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِم " قَالَ -غَيْرَكَ .

বর্ণনাকারী সুফইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ 'আস-সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যেন আমাকে এ সম্পর্কে "আপনার পরে" অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আবূ উসামার হাদীসে রয়েছে- আপনি ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না। তিনি বললেন, 'বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম', অতঃপর এর ওপর অবিচল থাক।

❖ ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্মমন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

অবিচল থাকার ব্যাখ্যা :

তিনি বলেন : সমগ্র কুরআনে রাসূল ﷺ-এর ওপর এই আয়াতের চেয়ে কঠিন ও ভারী কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

এ কারণেই সাহাবীগণ যখন বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চুল দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে।"

তখন তিনি বললেন : "সূরা হূদ এবং তার অনুরূপ সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।"

আবুল কাশেম আলকুশাইরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'রিসালাহ'-তে বলেন: ইস্তিকামাত এমন একটি মর্যাদা, যার দ্বারা সমস্ত কাজ পূর্ণতা পায় এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এর মাধ্যমেই কল্যাণসমূহ অর্জিত হয় এবং তা সুসংগঠিত থাকে।

যে ব্যক্তি তার অবস্থায় ইস্তিকামাত অবলম্বন করতে পারে না, তার প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়।

তিনি আরও বলেন : কেউ কেউ বলেছেন-ইস্তিকামাত কেবল মহান ব্যক্তিরাই ধারণ করতে পারে; কারণ এটি হলো প্রচলিত অভ্যাস ও রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে আসা এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে সত্যিকার আন্তরিকতার সঙ্গে দাঁড়ানো।

এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমরা ইস্তিকামাত অবলম্বন করো, কিন্তু (পূর্ণভাবে) তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আল ওয়াসেতী বলেন : এটি এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে সমস্ত সৌন্দর্য পূর্ণতা পায়; আর এটি না থাকলে সব সৌন্দর্যই বিকৃত হয়ে যায়।

আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যেসব মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

১। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী নিম্নবর্ণিত শব্দে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ.

বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন

একটি কথা বলুন, যা আমি মেনে চলতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, আল্লাহ্ই আমার রব (প্রভু) তারপর এতে সুদৃঢ় থাকো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন : এই যে, এটি।[১১]

ইমাম ইবনে মাজাহ নিম্নের শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ»

বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি ধারণ করতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, আল্লাহ্ই আমার রব (প্রভু) তারপর এতে সুদৃঢ় থাকো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন : এই যে, এটি।[১২]

মুসনাদুদ্দারমী হাদীসটি নিম্নের শব্দে বর্ণনা করেছেন

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا قَالَ اتَّقِ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.

আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের মধ্যে এমন আমল সম্পর্কে সংবাদ দিন যেটা সম্পর্কে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো তারপর এর ওপর অবিচলিত থাকো। তিনি বলেন, আমি বললাম, তারপর কোন জিনিসটি আমল করব তিনি নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করে বললেন যে, এটা সংরক্ষণ করো।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে তিনবার উল্লেখ করেছেন।[১৩]

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবী'আ ইবন হারিস- এভাবেও বলা হয়; আবার বলা হয়: সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবি রাবী'আ। আরো বলা হয় : সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবন হুতাইত আস-সাকাফি। আবার একথাও বলা হয়েছে : সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আমর; আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আমরাহ। তিনি আস-সাকাফী আত-তায়েফী ছিলেন। তিনি তায়েফে বসবাসকারী ছিলেন। তার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি এবং ইবন হাজার 'আসকালানী তাকরিবুত তাহজিবে বলেন, তিনি সাহাবী। তাকে ওমর ইবনুল খাত্তাব তায়েফে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

এ হাদীসের সমার্থবোধক কিছু হাদীস নিম্নে দেয়া হলো :

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন : 'তোমরা সোজা পথে চল (ইস্তিকামত অবলম্বন কর), যদিও পূর্ণভাবে তা করতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো সালাত, আর কেবল মুমিনই অজু রক্ষা করে'।[১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ " . قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ .

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : 'তোমরা সঠিক পথে চল এবং কাছাকাছি থাকার চেষ্টা কর, সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না'।

[১১] জামে' আত-তিরমিযী।
[১২] সহীহ্ ইবনু মা-জাহ।

সহীহ ইবনু হিব্বান হা : ৫৬৯৮ ও ৫৬৯৯, ও মাওয়ারিদুয যাম'আন।
[১৪] আহমাদ হা : ২১৮৮৩, ২১৯২৭, দারিমী হা : ৬৫৫।

সাহাবীগণ বললেন : আপনাকেও না, হে আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন : 'আমাকেও না, যদি না আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন'।[১৫]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»

আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : 'কোনো বান্দার ঈমান সঠিক হবে না, যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হয়। আর তার অন্তর সঠিক হবে না, যতক্ষণ না তার জিহ্বা সঠিক হয়'।[১৬]

عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا»

নবী ﷺ বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম হবে তারা, যাদের চরিত্র উত্তম'।[১৭]

এটি ইস্তিকামাতের পূর্ণতার অংশ।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : 'তোমরা সঠিক পথে চল এবং কাছাকাছি থাকার চেষ্টা কর। জেনে রাখো, কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়'।[১৮]

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»

শাদ্দাদ ইবন আওস ﵁ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে'।[১৯]

[১৫] সহীহ মুসলিম হা : ৭০০৯।
[১৬] আহমাদ হা : ১৩০৪৮, ত্বাবারানী হা : ১০৪০১।
[১৭] তিরমিযী হা : ২০১৮, হাসান, সহীহুল জামে ২২০১।
[১৮] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, কিতাবুর রিকাক হা : ১৩৬।
[১৯] তিরমিযী হা : ২৪৫৯, মিশকাত হা : ৫২৮৯।

এটি ইস্তিকামতের অপরিহার্য অংশ।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ»...

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : 'নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে পথ দেখায়, আর সৎকর্ম জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়'।[২০]

সত্যবাদিতা ইস্তিকামাতের মূল।

عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا»

নবী ﷺ বলেছেন : 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। কেউ যদি কঠোরতা আরোপ করে, তবে তা তাকে পরাস্ত করবে। সুতরাং তোমরা সঠিক পথে চল এবং কাছাকাছি থাকার চেষ্টা কর'।[২১]

عن النبي ﷺ قال: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ»...

নবী ﷺ বলেছেন : 'তুমি আল্লাহকে হেফাজত কর (তাঁর হুকুম মানো), তাহলে তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন'।

এটি ইস্তিকামতের অন্যতম বড় ভিত্তি।

হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা

এসব হাদীস ইস্তিকামাতের যে বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়:

তাওহীদ ও আনুগত্যের ওপর দৃঢ় থাকা।

মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, বাড়াবাড়ি না করা।

অন্তর ও জিহ্বা সংশোধন করা।

নেক আমলে ধারাবাহিকতা রাখা।

আল্লাহ বলেন : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থ তুমি তোমার রবের ইবাদত করো তোমার কাছে তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া অবধি।

আল্লাহ সারা পৃথিবীর সকল নর-নারীকে আল্লাহর ইবাদতের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন।

[২০] সহীহ বুখারী হা : ৫৬৬৪।
[২১] সহীহ বুখারী হা : ৩৮।

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ইতঃপূর্বে একাধিকবার হজ্জ পালনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু বদর প্রান্তরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এবারেই সে সুযোগ অবধারিত হয়। যুদ্ধস্থল পরিদর্শন করে বিমোহিত হই। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে সংঘটিত এ যুদ্ধ কতই না গুরুত্বপুর্ণ ছিল তা ভাবা যায় না। নবী ﷺ-এর দু'আও ছিল হৃদয়গ্রাহী। যাঞ্ছা ছিল অন্তরঙ্গ। হে আল্লাহ! তুমি যদি বিজয় সুনিশ্চিত না করো ইসলামের নাম মুছে যাবে। নাম নেবার কেউ থাকবে না। তাঁর এ দু'আর প্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের আয়াত নাজিল হয়। সাহস সঞ্চারনী আয়াতটি ছিল-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা।[১]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! ইতঃপূর্বে এতদবিষয়ে লিখেছি। কিন্তু বদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে আরো কিছু বিষয় আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি। বদর শব্দটি আরবি। এর আক্ষরিক অর্থ পূর্ণিমার চাঁদ। তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার অতিক্রম করে পূর্ণিমার পূর্ণচ্ছটা চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে পথ চলার নির্দেশনা। মাত্র ৫০০ বছর তাওহীদের দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ঈসা নবীর অন্তর্ধানের পর হতে ৬১০ সাল পর্যন্ত সে সময়কাল ধরা হয়। দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে বায়তুল্লাহতে অসংখ্য মূর্তি জায়গা করে নেয়। শির্ক ও বিদ'আতের জঞ্জালে সমগ্র আরব উপদ্বীপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশ লোকই ধর্মহীনতা, ঘৃণ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধারণা, জড়পূজা ও সৌরপূজায় লিপ্ত ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অসারতা দেখে বিস্মিত সেমেটিক প্রফেসর ফিলিপ কে, হিট্টি বলেছেন, ব্যাবিলনবাসীদের মতো পৌত্তালিক আরবগণের কোনো পুরাণতত্ব, ধর্মতত্ব অথবা বিশ্বোৎপত্তির কোনো তত্বজ্ঞান ছিল না। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে, মরুবাসী আরবগণ অবিশ্বাস ও ভণ্ডামীতে আত্মনিয়োগ করেছে।[২]

লাত মানাত ও আল-উজ্জা নামধেয় তিনটি মূর্তি ধর্মীয় চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। ধর্মের নামে অধর্মের যুপকাষ্ঠে মানবকুল ছটপট করছিল। এমনি একটি মর্মস্পর্শী পরিবেশে মহানবীর আর্বিভাব ছিল আরব তথা বিশ্বমানবতার জন্য আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতি ও তার দাওয়াতী কার্যক্রম সুখকর ছিল না। অগত্যা আল্লাহর নির্দেশে নবীকে হিজরত করতে হয়। সেখানে এসে আবার কুরাইশদের অত্যাচার মোকাবেলা ও দাওয়াতী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এটি ছিল একটি মারাত্মক পরীক্ষা।

এমনি অকুতোস্থল পরিদর্শন সন্দেহাতীতভাবে শিহরণ সৃষ্টিকারী ঘটনা। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বদর নামে একটি কূপ ও বসতিস্থল ছিল। সেই কূপের নামানুসারেই জায়গাটির নাম বদর হয়। এটি কিন্তু সাধারণ যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধের ফলে মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। মক্কাবাসীদের অত্যাচারের কারণে মুসলিমরা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। বদরের বিজয় তাদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বদর যুদ্ধের কারণে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত হয়। মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান শক্তিশালী হয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

❖ **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং **প্রফেসর ও সাবেক ডিন,** স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১] সূরা আল-আনফাল আয়াত : ৯।

[২] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৯৮।

পথ সুগম হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অনেক বড় বড় নেতা নিহত হয়। ফলে মক্কার কুরাইশদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত কিন্তু কুরাইশদের এ পরিকল্পিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা 'আহলে বদর' নামে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। এ অসম যুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষে ছিল ১০০০ জন আর মুসলিমরা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। অসামান্য রণনৈপুণ্য অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বিধর্মী কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭০ জন মুশরেক সৈন্য নিহত হয়। সমসংখ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপরদিকে মুসলিমদের পক্ষে ১৪ জন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতবরণকারী ১৪ জন সাহাবির কবর আমি স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হয়েছি। শাহাদাতবরণকারী সাহাবিদের মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার ছিলেন। পাঠকদের সৌজন্যে পবিত্র নামগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

মুহাজির (৬)

১. উবাইদা ইবনুল হারিস

২. উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস

৩. যুআল সুলাইমান ইবনে আবু আমর

৪. আক্বীল ইবনে আল বুকাইর

৫. মিহজা

৬. সাফওয়ান ইবন আল বায়দা

আনসার (৮)

(আওস গোত্র থেকে)

৭. সাআদ ইবনে কায়সামা

৮. হাবিসা ইবনে সুরাকা

(খাযরাজ গোত্র থেকে)

৯. আউফ ইবনে আল হারিস

১০. মুআইজ ইবনে আল হারিস

১১. রাফি ইবনে আল মুসাল্লা

১২. সাআদ ইবনে আল রাবি

১৩. ইয়াজিদ ইবনে আল হারিস

১৪. মু'আজ ইবনে আফরাহ

(বদর শহীদদের নামফলক। দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তিত গারকাদ বৃক্ষ ও ধূসর মরুর খণ্ডচিত্র)

ধন্য পিতার ধন্য সন্তান শোহাদায়ে বদর আমাদেরও ধন্য করেছে। বদর প্রান্তরের সুষমা ও সৌন্দর্য কতই না মনোহর! ফিরে আসতে মন চায় না। কিন্তু মাইক্রো ওয়ালার তাগিদ ও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে সফর সংক্ষেপ করতে হলো। স্বল্প সময়ে যা দেখলাম সেসব নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এতদসম্পর্কে একটা লেখচিত্র না দিয়ে পারি না। সেখানে আছে- কূপসমূহ, আরীশ বা নবিজী দু'আর স্থান। আছে একটি স্মৃতিফলক। শহীদদের কবরস্থানে আজো আমাদের চৌদ্দশত বছর পেছনে ফিরিয়ে নেয়। এছাড়া বিস্তীর্ণ বদর প্রান্তর ও মাসজিদ আমাদের মনকে আবেগময় করে তোলে। -(চলবে ইন শা-আল্লাহ)

সালাফ চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু
অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

পর্ব-২

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

মুসলিম জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বীরদের মধ্যে এক বীরপুরুষ ছিলেন সম্মানিত সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার জন্মের বছর নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ ইসলাম গ্রহণ করার সময় তার বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ১৯ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে তিনি সতেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি ১৯ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেছি। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বলা হয় যে, তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের তৃতীয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সপ্তম। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছেন এবং নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ارم فداك أبي وأمي "তীর ছুঁড়ো, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীকৃত হোন।" তিনি নবী ﷺ-এর মামাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের মনোনীত শূরা পরিষদের ছয় সদস্যের অন্যতম ছিলেন।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশে প্রতিপালিত হন এবং তীর-ধনুক নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে সাসানীয় সাম্রাজ্যের শহরগুলো জয় করা হয়। তিনিই প্রথম আল্লাহর পথে রক্তপাত করেন এবং ইসলামে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। উহুদের দিন নবী ﷺ-কে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর সাহস ও বীরত্ব দেখে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ارم فداك أبي وأمي "তীর ছুঁড়ো, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোন।"

তার ইসলাম গ্রহণের কারণ : বলা হয়ে থাকে যে, একটি স্বপ্নই ছিল তার ইসলামে প্রবেশের কারণ। এ বিষয়ে তার কন্যা আয়েশা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইসলাম কবুলের আগে আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি ঘন অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তখন হঠাৎ দেখলাম একটি নক্ষত্র আমাকে আলো দিচ্ছে। আমি সেই আলোর অনুসরণ করে চললাম। দেখলাম কারা যেন আমার আগেই সেই আলোর দিকে অগ্রণী হয়ে গেছে। ভালোভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলাম, তারা হলেন যায়েদ বিন হারেছা, আলী এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর আমি যেন তাদেরকে প্রশ্ন করছি, আপনারা কখন এখানে এসেছেন? তারা জবাবে বললেন, এইমাত্র এসেছি। উল্লেখ্য যে, এরা সকলেই সা'দের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বপ্নটাকেই তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মা ছিল ইসলামের ঘোর বিরোধী। তাই সে যখন তার পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনতে পেলো, তখন সে বললো, আল্লাহর কসম! সা'দ ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি কোনো

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

কিছু খাবো না ও পান করবো না। হয় সে ইসলাম ত্যাগ করবে আর না হয় আমি এভাবেই মৃত্যুবরণ করবো। সা'দ তার মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামের ওপর টিকে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন। সা'দের এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো। অতঃপর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করবো।[৩]

সা'দ বলেন, আমি ছিলাম আমার মায়ের প্রতি অত্যন্ত সদাচারী। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সে বললো, হে সা'দ! এটা কেমন দ্বীন, যা তুমি গ্রহণ করেছো? তুমি অবশ্যই এ দ্বীন বর্জন করবে। অন্যথায় আমি কথা বলবো না, পানাহার করবো না। তুমি অবশ্যই ইসলাম ত্যাগ করবে। তা না হলে আমি মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই থাকবো। ফলে তোমাকে মায়ের হত্যাকারী হিসেবে দোষারোপ করা হবে। সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে আমার মা! তুমি এমনটা করো না। আমি কখনো আমার দ্বীন বর্জন করবো না। সে একদিন একরাত এভাইে থাকলো। এর মধ্যে সে পনাহার না করার কারণে খুব দুর্বল হয়ে পড়লো। আমি তখন বললাম, আল্লাহর কসম! হে আমার মা! তোমার যদি একহাজারটি প্রাণ থাকে অতঃপর এভাবে না খেয়ে থাকার কারণে একটি একটি করে তোমার সবগুলো প্রাণ বের হয়ে যায়, তাহলেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না। সা'দের মা দ্বীনের ওপর সা'দের দৃঢ়তা দেখে নিজে নিজেই পানাহার শুরু করলো। এই প্রেক্ষাপটেই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় রক্ত প্রবাহিত করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মুসলিমগণ মক্কায় থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হলে পর্বতঘেরা স্থানে চলে গিয়ে গোপনে সালাত আদায় করতো। একদা সা'দ যখন একদল মুসলিমের সাথে কোনো পর্বতঘেরা স্থানে ছিলেন, তখন একদল কুরাইশ লোক তাদেরকে দেখে দোষারোপ করতে লাগলো এবং গালাগালি করতে লাগলো। একপর্যায়ে তাদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সা'দ উটের হাড্ডি দিয়ে তাদের এক লোককে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে যায়। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম রক্তপাত।

সা'দ প্রথম মুহাজিরদের সাথে নবী ﷺ-এর আগেই মদীনায় হিজরত করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সবগুলো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সময় সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর উমার রাযিয়াল্লাহু খলীফা হলেন। তার শাসন কালের শুরুর দিকেই পারস্যবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃতীয় ইয়াজীগ্রাডকে তাদের শাসক নিযুক্ত করলো এবং মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সেখানকার অমুসলিমরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করলো। তারা তাদের অঞ্চল থেকে মুসলিম গভর্নরদেরকে বের করে দিলো। এতে উমার ইবনুল খাত্তাব রাগান্বিত হয়ে নিজেই ১৪ হিজরীর মুহাররাম মাসের প্রথম দিন বাহনে আরোহণ করে ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প হলেন। এসময় তিনি আলীকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন এবং নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা জানালেন। সভায় সমবেত

[৩] সূরা লুকমান আয়াত : ১৫।

সকলেই তাঁর ইরাক যাওয়ার প্রতি একমত পোষণ করলো। কিন্তু আব্দুর রাহমান বিন আওফ এতে দ্বি-মত পোষণ করলেন। তার আশঙ্কা ছিল, ইরাকে গিয়ে যদি তিনি পারস্যবাসীর মোকাবেলা করে পরাজিত হন, তাহলে সমস্ত ইসলামী অঞ্চলেই মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, উমার মদীনাতেই থেকে যাবেন এবং তাঁর বদলে অন্য একজনকে ইরাকে পাঠানো হবে। উপস্থিত লোকেরা ইবনে আওফের মতকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করলো। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনে আওফকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মতে কাকে ইরাকে পাঠানো উচিত? আব্দুর রাহমান বিন আওফ বললেন, আমি একজন সিংহ পুরুষকে সেখানে পাঠানো উচিত বলে মনে করি। উমার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? আব্দুর রাহমান বললেন, তিনি হলেন, সা'দ বিন মালেক আয্-যহরী। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁকে ইরাকের শাসক নিযুক্ত করলেন এবং তাকে পারস্যবাসীদের মোকাবেলা করার দায়িত্ব দিলেন।

অতঃপর সা'দকে ইরাকে পাঠানের পূর্বে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করেন :

হে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস! এ বিষয়টি যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয় যে, আপনি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মামা এবং সঙ্গী। কারণ আল্লাহ মন্দকে মন্দ দিয়ে মুছে দেন না, বরং তিনি ভালো দিয়ে মন্দকে মুছে দেন। আর আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া তাঁর সাথে কারো কোনো আত্মীয়তা নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ সমান। সম্ভ্রান্ত হোক বা নীচু হোক, সবাই সমান। আল্লাহ তাদের রব এবং তারা তাঁর বান্দা। তাদের ধার্মিকতার দ্বারাই তাদের মর্যাদার তারতম্য হয় এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর প্রেরণের সময় থেকে শুরু করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় পর্যন্ত আমরা যে বিষয়ের ওপর রয়েছি তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তার ওপর দৃঢ় থাকো। এটাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ। যদি তুমি তা পরিত্যাগ করো এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তোমার আমল মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (চলবে) ❑❑

শজনেপাতায় যেসব উপকার পাবেন

শজনেপাতা ও ডাঁটা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের জন্য জরুরি। এটি ফ্রি র‍্যাডিক্যালের কারণে হওয়া ক্ষতি (অক্সিডেটিভ স্ট্রেস) থেকে কোষকে রক্ষা করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রদাহকে (ইনফ্লুযামেশন) বাড়িয়ে দেয়। এই প্রদাহ ডায়াবেটিস, ডিমেনশিয়া, করোনারি আর্টারি ডিজিজ ও ক্যানসারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ সৃষ্টি করে।

শজনেপাতা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন কে-এর মতো পুষ্টি উপাদান থাকে।

শজনেপাতায় থাকা এসব পুষ্টি উপাদান অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সঙ্গে মিলে শক্তিশালী হাড় গঠনে সাহায্য করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড়জনিত সমস্যা প্রতিরোধেও এটি ভূমিকা রাখে।

শজনেপাতায় থাকে ভিটামিন এ। এটি দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করার মাধ্যমে 'ম্যাকুলার ডিজেনারেশন'-এর মতো বয়সজনিত চোখের রোগ থেকে রক্ষা করে।

শজনেপাতা ও ডাঁটা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, আঁশ ও প্রোটিনসমৃদ্ধ। কিন্তু এতে ক্যালরি কম। শজনেপাতা ও ডাঁটা ক্ষুধা কমায়। এটি খেলে লম্বা সময় পেট ভরা থাকে।

পুষ্টিগুণে ভরপুর এই খাবার বিপাকক্রিয়া বাড়ায় এবং সারা দিন শরীরের শক্তির মাত্রা ভারসাম্যপূর্ণ রাখে।

শজনেপাতা নিয়মিত খেতে পারেন। তবে এটি আলাদাভাবে ওষুধের মতো করে খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য সব শাকসবজির মতোই এটি খাওয়া যেতে পারে।

সালাদ, তরকারি কিংবা ভাজি করে খেতে পারেন। সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে নিয়মিত খেলেই উপকার পাওয়া সম্ভব। সূত্র : ক্লিল্যান্ড ক্লিনিক

নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন?

শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানী❖

পূর্ব প্রকাশের পর থেকে

৪. যুক্তি ও তর্ক বলে মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই।

১ম যুক্তি : ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম মুজানী থেকে একটা যুক্তির অবতারণা করেন। যুক্তিটা হলো: মুকাল্লিদ বা মাযহাবপন্থী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আপনি যে মাযহাব মানছেন, তাকলীদ করছেন এ ব্যাপারে আপনার দলীল প্রমাণ কী? যদি বলে হ্যাঁ আমার কাছে এ ব্যাপারে দলীল, প্রমাণ আছে, তাহলে সে আর মুকাল্লিদ থাকল না বরং তিনি এ ব্যাপারে জ্ঞানী বা আলেম হওয়ার কারণে তার জন্য তাকলীদ নাজায়েয হয়ে গেল। আর যদি বলে, আমার কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ নেই। না জেনে, মাযহাবের ফতোয়া শুনে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেন, মানুষের জানমাল জায়েয করেন, অথচ আল্লাহ্ বলেন : إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا তোমাদের কাছে তার কোনো সনদ নেই। আল্লাহ্ আরো বলেন : مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি প্রমাণ আছে। [৪]

তখন যদি উক্ত মুকাল্লিদ বা মাযহাবী লোকটি বলে আমি সঠিক করেছি, আমি এ ব্যাপারে কোনো দলীল প্রমাণ জানি না, কারণ আমি অমুক ইমামের বা আলেমের মাযহাবের অনুসারী, আর ঐ সকল ইমাম, আলেম কি দলীল প্রমাণ ছাড়া ফতোয়া দিয়েছেন? আর দলীল আছে যা হয়ত আমি জানি না।

তখন উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলতে হবে, হ্যাঁ আপনি যে অমুক আলেমের বা ইমামের মাযহাবের অনুসরণ করছেন এ ভেবে যে, তিনি দলীল প্রমাণ ছাড়া এমন ফতোয়া দেবেন না, যে দলীল হয়ত আপনার জানা নেই, যদি এমনই হয়, তাহলে তো আপনার উচিত আপনার ইমামের ইমাম, শিক্ষকের শিক্ষককে তাকলীদ করা, তার কথা মানা, কারণ আপনি যার তাকলীদ করছেন, যার কথা মানছেন, এ ভেবে যে, এ ব্যাপারে আপনার দলীল-প্রমাণ জানা নেই বরং আপনার ইমামের জানা আছে। ঠিক তেমনিভাবে আপনার অনুসরণীয় ইমামের বা আলেমেরও তো অনেক দলীল প্রমাণ জানা না থাকতে পারে। এমনিভাবে ব্যাপারটা রাসূলের সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বা রাসূল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাদের অনুসরণ করলে মাযহাবী তাকলীদ বাদ হয়ে যাবে। [৫]

২য় যুক্তি : ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অযৌক্তিক তাকলীদ মানার প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে আরো একটা যুক্তি পেশ করেছেন, যুক্তিটি নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা আবশ্যক মনে করে, তাকে বলতে হবে। কেন আপনি সালফে সালেহীন তথা সাহাবী, তাবেঈগণের খেলাপ করে মাযহাব মানছেন, তাকলীদ করছেন, অথচ তারা মাযহাব মানেননি, তাকলীদ করেননি। যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলেন, এর কারণ আমার কুরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, অতএব আমি যাকে মানি, যার তাকলীদ করি, তিনি আমার চেয়ে এ ব্যাপারে জ্ঞানী। উক্ত মুকাল্লিদকে বলতে হবে, ঠিক আছে, যেসব বিষয়ে ইমামগণ, আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন, সে ব্যাপারে আপনি মানতে পারেন। কিন্তু যে ব্যাপারে মতানৈক্য, মতবিরোধ সে ব্যাপারে কেন মানছেন? যেমন আপনি এক মাযহাবকে, একজন ইমামকে মানছেন, অপর মাযহাব, অন্য ইমামকে প্রত্যাখ্যান করছেন, এ ব্যাপারে আপনার দলীল প্রমাণ কী? অথচ আপনারা বলেন, সকল ইমাম জ্ঞানী, সকল মাযহাব সঠিক, আর এমনও তো হতে পারে, আপনি যে মাযহাব মানছেন, যে ইমামের তাকলীদ করছেন, তার চেয়ে অন্য মাযহাব, অন্য ইমাম তো সঠিক হতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার গ্যারান্টি কী? যদি উক্ত মুকাল্লিদ বলে, আমি ঐ মাযহাব মানি, অমুক ইমামের অনুসরণ করি, এ জন্য যে অমুক মাযহাব, অমুক ইমাম সঠিক। তাকে জিজ্ঞাসা করতে

❖ প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী বাংলাদেশ।

[৪] সূরা ইউনুস আয়াত : ৬৮।

[৫] জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি ২/৯৯২-৯৯৩ আরো দেখুন, ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনে কাইয়ুম ২/১৯৬-১৯৭।

হবে, কিভাবে জানলেন অমুক মাযহাব, অমুক ইমাম সঠিক? যদি বলেন, কুরআন, হাদীস, ইজমা ইত্যাদি দ্বারা জানতে পেরেছি, তাহলে তিনি আর মুকাল্লিদ থাকলেন না, বরং কুরআন, হাদীসের অনুসারী (আলেম) হয়ে গেলেন।

আর যদি বলে আমি অমুক ইমামের তাকলীদ করি, কারণ তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী। তাহলে তাকে বলতে হবে, এমনিভাবে আপনার চেয়ে জ্ঞানী সকলেরই তাকলীদ করেন। নির্দিষ্টভাবে কোনো ইমামের তাকলীদ করেন কেন? তখন যদি উক্ত মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাই বলেন, আমি অমুক ইমামের তাকলীদ করি, কারণ তিনি অন্য সকলের চেয়ে জ্ঞানী, তাহলে তাকে বলতে হবে, আপনার অনুসরণীয় ইমাম কি সাহাবী থেকেও জ্ঞানী? যদি উক্ত ব্যক্তি বলে, আমি কিছু সাহাবীকে ছেড়ে কিছু সাহাবীর অনুসরণ করি, তখন তাকে বলতে হবে, আপনি যে কিছু সাহাবীকে ছেড়ে কিছু সাহাবীর অনুসরণ করছেন, এ ব্যাপারে আপনার দলীল কী? কারণ এমন তো হতে পারে, যাদের কথা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা আপনার অনুসরণীয় সাহাবাগণের থেকে সঠিক ও উত্তম। আর রাসূলের সহীহ হাদীস যে সাহাবীর সাথে থাকবে, তার অনুসরণ করতে হবে, অন্যকে না। [৬]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ : যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।[৭]

৩য় যুক্তি : তাকলীদপন্থী মাযহাবী ভাইদেরকে বলি : আপনারা যে ইমামের নামের ব্যানার নিয়ে হনহন করে হাঁটছেন, আসলে তো আপনি সে ইমামের অনুসারী না। যদি উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলেন, কেন? উত্তরে বলি, আপনার অনুসরণীয় ইমাম আপনাকে তার তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন যে, আমার অনুসরণ, আমার কথা, প্রমাণ হিসাবে পেশ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয না, যতক্ষণ সে না জানবে, আমি কোথা থেকে গ্রহণ করেছি ..ইত্যাদি ইত্যাদি। [৮]

অতএব আপনি তো তার মুখালেফ, অবাধ্য, তাহলে আপনি কিভাবে উক্ত ইমামের, উক্ত মাযহাবের অনুসারী থাকলেন। এটা আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবি মাত্র। আপনি যদি উক্ত ইমামের বা মাযহাবের কথা মানেন, তাহলে আপনাকে অন্ধ তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে সহীহ হাদীস ও সহীহ দলীলভিত্তিক মাসআলা মাসায়েল মানতে হবে, যেমনি আপনার ইমাম বলেছেন। তাহলেই আপনি উক্ত মাযহাবের বা ইমামের অনুসারী হতে পারবেন, অন্যথায় নয়। [৯]

৪র্থ যুক্তি : মুকাল্লিদ বা মাযহাবপন্থী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আপনার অনুসরণীয় ইমাম, আপনার অনুসরণীয় মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বের লোকেরা সাহাবাগণ, তাবেঈগণ কার অনুসরণ করতেন? কোন মাযহাব মানতেন? তারা কি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না? নাকি তাঁরা পথভ্রষ্ট ছিলেন? নিশ্চয় মুকাল্লিদ ভাই বলবেন, তাঁরা সত্য ও হক্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাঁরা কাকে অনুসরণ করে, কার কথা মেনে সঠিক পথের ওপর ছিলেন। নিশ্চয় উত্তরে বলবেন, কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের কথা মেনে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তাকে বলতে হবে, কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের পথ অনুসরণ করা যদি সত্য ও হক্ক হয়ে থাকে, তাহলে অন্ধ ও ব্যক্তি তাকলীদ করা, বিভিন্ন ইমাম, বিভিন্ন মাযহাব মানা ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু না। তখন যদি মুকাল্লিদ ভাই বলেন, মাযহাব তো কুরআন, হাদীসের কথাই বলে, তখন তাদেরকে বলতে হবে যে, আপনার ইমাম, আপনার মাযহাব কি শুধু একথা বলে, না অন্য মাযহাবের ইমাম বা অন্য মাযহাবও আপনাদের মতো কুরআন হাদীসের কথা বলে? তখন যদি উত্তরে বলে, শুধু আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাব কুরআন,

[৬] ইলাম, ইবনুল কাইয়্যিম ২/১৯৮-১৯৯।
[৭] সূরা আয-যুমার আয়াত : ১৮।
[৮] বিস্তারিত দেখুন : উক্ত বইয়ের মাযহাব মানা সম্বন্ধে ইমাম ও আলেমগণের উক্তি অধ্যায়।
[৯] সার সংক্ষেপ ইলাম, বিন কাইয়ুম ২০৭ ও ২১০পৃ.।

হাদীসের কথা বলে, অন্যরা বলে না, তখন তারা মিথ্যুক ও ভ্রষ্ট হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর যদি বলে, সকল ইমাম, সকল মাযহাব, কুরআন, হাদীসের কথা বলে, তখন তাদেরকে বলতে হবে, সকল ইমাম, সকল মাযহাব, যখন কুরআন, হাদীসের কথা বলে, তাহলে নির্দিষ্টভাবে কেন এক ইমাম ও এক মাযহাব মানেন? আর অন্য সকল ইমাম ও অন্য মাযহাব প্রত্যাখ্যান করেন? অথচ সত্য যে একজন ইমাম ও এক মাযহাবে আছে, অন্য কোনো ইমাম ও অন্য কোনো মাযহাবে নেই এর দলীল প্রমাণ তো তাদের কাছে নেই। তাহলে একজন ইমাম, একটা নির্দিষ্ট মাযহাব মানা গোঁড়ামী নয় কি? [১০]

৫ম যুক্তি : মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাইদেরকে বলতে হবে, আপনি সকল ইমাম, সকল মাযহাব বাদ দিয়ে শুধু এক ইমাম ও এক মাযহাবের অনুসরণ করেন। যে ইমামের কথা মানেন, তার কথা, তার মাযহাব যে ঠিক কিভাবে জানলেন বা এ ব্যাপারে আপনার প্রমাণ কী? যদি উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলে : এ ব্যাপারে আমার কাছে কুরআন, হাদীস থেকে প্রমাণ আছে, তখন কিন্তু তিনি আর মুকাল্লিদ থাকলেন না বরং তিনি একজন আলেম ও কুরআন, হাদীসের অনুসারী হয়ে গেলেন। আর যদি বলে, আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন এ কথা বলেছেন, তারা এতবড় জ্ঞানী হওয়ার পরেও কি ভুল ফতোয়া দেবেন! ভুল কথা বলবেন! তখন মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলতে হবে, আপনার মাযহাবের ইমাম, আপনার মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ কি মাসুম, নির্ভুল ব্যক্তি যার কোনো ভুল হবে না? নাকি তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীপ্রাপ্ত? যদি বলে, তিনি নির্ভুল মাসুম, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভ্রান্ত। কারণ রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ মাসুম না। আর যদি বলে : না আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাবের বড় বড় আলেম ভুলের উর্ধ্বে নয়। তখন তাকে বলতে হবে, এমনও তো হতে পারে যে, আপনার ইমাম, আপনার আলেমের ফতোয়া কোনো কোনো বিষয় ভুল, আর অন্য ইমামের মাযহাবের প্রদত্ত ফতোয়া সঠিক, তারপরেও আপনি তার প্রদত্ত ফতোয়াকে অনুসরণ করছেন, অথচ আপনার এভাবে ভুল ফতোয়া অনুসরণ করাটা ঠিক না।

যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলে, আমার ইমাম যদি ভুলও করে তবুও তিনি একটা নেকি পাবেন। তাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, তিনি একটা নেকি পাবেন, তার ইজতেহাদ করার কারণে, আর আপনি গুনাহগার হবেন তার অন্ধ তাকলীদ করার কারণে। ইমাম ভুল করলেও নেকি পাবেন, আর আমি তার তাকলীদ করে গুনাহগার হব? উত্তরে বলতে হবে, হ্যাঁ, এটাই সত্য, কারণ ইমাম সাহেব তার ব্রেন, মেধা, খাটিয়ে চেষ্টা করে ফতোয়া দিয়েছেন, যদিও ভুল হয়, তবুও তিনি একটা নেকি পাবেন। তার প্রচেষ্টার কারণে, আর আপনি গুনাগার হবেন চেষ্টা যাচাই বাছাই না করার কারণে। কারণ মুকাল্লিদ যদি মূর্খও হয়, তাহলে দুনিয়ার ব্যাপারে, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সে যাচাই বাছাই করার প্রচেষ্টা করে, তারপর ব্যবসা করে ব্যবসায় উন্নতি করে। আর দ্বীনের ব্যাপারে যাচাই-বাছাই, প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে এক কথা, আমাদের ইমাম, আমাদের আলেম, আমাদের হুজুর কি কম জানে? ভাই, আপনাকে বলি, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র সামনে কী উত্তর দিবেন? অথচ সেদিন যে ইমামের, যে আলেমের, যে মাযহাবের অনুসরণ করেই চলেছেন, তারা আপনাকে কোনো সাহায্য করবে না। অতএব, সময় থাকতে সাবধান, যতদূর সম্ভব মাযহাবী গোঁড়ামি ছেড়ে কুরআন, হাদীসের অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ আমাদের সত্য জানার ও মানার তৌফিক দিন। আমীন!

৬ষ্ঠ যুক্তি : মুকাল্লিদ ও মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা তাদের মাযহাব মানা ও তাকলীদ করার মাধ্যমে আল্লাহ্, রাসূল ﷺ, সাহাবাগণ ও সকল ইমামের কথার অবাধ্য হয়েছেন, যদি তারা প্রশ্ন করেন কিভাবে? উত্তরে বলবো, আল্লাহ্র কথার অবাধ্য হয়েছেন এভাবে, আল্লাহ্ বলেন :

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

[১০] ইলাম আল মুয়াক্কিয়ীন, ২/২১০ ২১১।

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে মতানৈক্য, ইখতেলাফ, মতবিরোধ হলে উক্ত বিষয়টাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিতে, অর্থাৎ কুরআন, হাদীসের দিকে ফিরিয়ে নিতে। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [১১]

আর মুকাল্লিদপন্থী মাযহাবী ভাইয়েরা তা না করে বরং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টাকে তাদের মাযহাবের দিকে, তাদের অনুসরণীয় ইমামের দিকে ফিরিয়ে নেন। মাযহাবী ভাইয়েরা যদি বলেন : আমরা এ ব্যাপারে কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলাম, উত্তরে বলবো : রাসূল ﷺ মতানৈক্য, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়কে তাঁর সুন্নাতের ও সাহাবাগণের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। কিন্তু তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা বলেন, না মতানৈক্য ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমরা আমাদের মাযহাব, আমাদের ইমামের মতের কথার দিকে ফিরিয়ে নেই। তারা এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীসকে পরিত্যাগ করে, মাযহাবের কথা, মাযহাবের ইমামের কথা ও মতকে প্রাধ্যান্য দেয় ও তার কথা অনুসরণ করে।

মাযহাবী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা রাসূলের সাহাবীগণেরও অবাধ্য ও তাদের মতাদর্শ থেকে অনেক দূরে। যদি তারা প্রশ্ন করেন কিভাবে? উত্তরে বলবো : সাহাবাগণের আদর্শ, নিয়মনীতি এমন ছিল, তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো সাহাবীর অনুসরণ করতেন না। এ জন্য সাহাবাগণের যুগে কাউকে বলা হতো না আবু বকরী, উমারী, উসমানী, মাসুদী, আব্বাসী। যেমনিভাবে এখন বলা হয়, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ইত্যাদি।

আর মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাদের অনুসরণীয় মহামতি ইমামগণেরও অবাধ্য। যদি বলেন কিভাবে? উত্তরে বলবো : অনুসরণীয় সকল মহামতি ইমামগণ তাদের গোঁড়া, অন্ধানুকরণ তথা তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। মাযহাব মানতে বলবে কি, মাযহাব তো তখন ছিলই না। আর সকলে বলে গেছেন : إذا صح الحديث فهو مذهبي . যখন কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তার অনুসরণ করাই আমার আদর্শ। [১২]❑❑

[১১] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৫৯।
[১২] নেহাযাতুন নেহায়া-রাদ্দুল মুহতার- ১/৪৬২।

স্মার্টফোন আসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব

১. আজকের শিশুরা রেডিয়েশন ঘেরা এক পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে। শিশুদের মস্তিষ্ক ইলেকট্রনিকস পণ্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। বড়দের তুলনায় শিশুদের মস্তিষ্ক প্রায় দ্বিগুণ এবং অস্থিমজ্জা প্রায় দশ গুণ বেশি বেতার তরঙ্গ শোষণ করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তাদের মস্তিষ্ক ও কানে নন-ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার উচ্চতর আশঙ্কা থাকে।

২. মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের রেটিনা, কর্নিয়া এবং অন্যান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মায়োপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টি সমস্যা। এই রোগের কারণে চোখে যন্ত্রণা ও মাথাব্যথায় ভোগে শিশুরা, ক্লাসের পেছনে বসলে সামনের বোর্ড স্পষ্ট দেখতে পায় না। ইদানীং খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের চশমা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

৩. মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে থাকা অগণিত জীবাণু সহজেই শিশুদের শরীরে প্রবেশ করে, কমিয়ে দেয় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা। এ ছাড়া তাদের মৃগীরোগ ও হাঁপানি রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

৪. স্মার্টফোনে আসক্ত বাচ্চারা অনেক রকম শারীরিক সমস্যা, যেমন মাথাব্যথা, হাত ও পিঠে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, অনিয়মিত খাওয়া, স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

৫. কিশোরদের সামনের প্যান্ট পকেটে মোবাইল ফোন রাখলে শুক্রাণু কমে যেতে পারে। কিশোরী মেয়েরা পোশাকের ভেতরে ফোন রাখলে স্তন ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি আছে।

৬. এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, স্মার্টফোনে আসক্ত বাচ্চাদের ঘন ঘন মেজাজ বদলে যায়। কারণ ছাড়াই রেগে যাওয়া, অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত ঘুম, অমনোযোগিতা, ভুলে যাওয়া, ভাষার দক্ষতা বিকাশ না হওয়া এবং ভাইবোন, বাবা-মা ও খেলার সাথিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাসহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হয়।

৭. ভবিষ্যতে আমাদের শিশুরা মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তারা নিজেদের সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলবে। ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হবে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো অটুট রাখার দক্ষতা শিখতে পারবে না। (ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন)

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব ❋

(৮ম পর্ব)

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্তীতে কুরআনবাদ

রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর থেকে প্রতিটি যুগেই কুরআনবাদের সরব উপস্থিতি ছিলো। ইতঃপূর্বে আমরা হিজরী ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত কুরআনবাদের ভ্রান্তির বিস্তার নিয়ে আলোকপাত করেছি, এখন আমরা ৪র্থ হিজরীর পরবর্তী সময়ের তাদের উপস্থিতি ও বিস্তৃতি নিয়ে আলোকপাত করবো ইন শা-আল্লাহু তা'আলা।

৫ম শতাব্দীতে কুরআনবাদ :

হিজরী ৫ম শতাব্দীতে কুরআনবাদের উপস্থিতি ও বিস্তার চলমান ছিল। আর সেই সময় ইমাম আলী বিন হুসাইন বিন আব্দুল কারীম আল হানাফী আল বাযদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি - যিনি বাযদভী নামেই সুপরিচিত- তিনি হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফক্বীহ ছিলেন। তিনি ৪০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৮২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কুরআনবাদের ভ্রান্তি রোধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি বাহাস মুনাযারা ও লিখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ মানহাজের প্রচার ও প্রসার করেছেন।

৮ম শতাব্দীতে কুরআনবাদ :

হিজরী ৮ম শতাব্দীতে ইমাম আশ শাত্বিবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি - (৭৯০ হিজরী), সেই সময় যারা হাদীস অস্বীকার করতো তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি আল মুআফাক্বাত নামে একটি কিতাব রচনা করেন এবং তাতে তিনি উল্লেখ করেন; নিশ্চয় অধিকাংশ বিদ'আতী শুধু কুরআন মান্য করার কথা বলে এবং সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকার করে। আর কুরআনের ব্যাখ্যা তারা সুন্নাহ বাদ দিয়ে নিজেদের মতো মনগড়া ব্যাখ্যা করে। অবশ্যই তারা নিজেরা পথভ্রষ্ঠ এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ঠ করে।[১৩]

৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে কুরআনবাদ :

হিজরী ৯ম শতাব্দীতে ইয়ামানে যায়েদীয়া কুরআনবাদের বিস্তার ঘটে। যায়েদীয়া হলো শী'আদের একটি দল, যারা যায়েদ বিন হুসাঈন বিন আলীর নামে নিজেদেরকে যায়েদীয়া পরিচয় দিয়ে থাকে। হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৬৭ হিঃ) সালাহুদ্দীন আইয়্যূবীর হাতে ফাতেমী শী'আ সাম্রাজ্যের পতনের পর তারা ইয়ামানে চলে যায় এবং ইয়ামান দখল করে নেয়। সূচনালগ্নে এদের আক্বীদাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছাকাছি ছিল এবং উগ্রবাদী ইমামপন্থি শী'আ ও রাফিজী শী'আদের থেকে ঈমান ও আমলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পরবর্তীতে তারা ঈমান ও আক্বীদায় উগ্রবাদী রাফেজী শী'আদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীসবিরোধী হয়ে ওঠে। হিজরী ৯ম শতাব্দীতে একজন যায়েদীয়া শী'আ ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবুল কাসেম (৭৬৯- ৮৩৮ হিঃ) সুন্নাহ বা হাদীসের প্রতি বিদ্বষমূলক বক্তব্য ও লিখনী লিখতে থাকলে তারই ছাত্র ইবনুল ওয়াযির রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআনবাদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে 'আল আওয়াসেম ওয়াল ক্বাওয়াসেম ফিয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল ক্বাসিম'– (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) এবং এ কিতাবটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আর রাওযুল বাসিমু ফিয যাব্বে আন সুন্নাতি আবিল ক্বাসিম'– (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) রচনা করেন এবং তাতে যায়েদীয়া কুরআনবাদের সমস্ত সংশয়ের দলীলভিত্তিক জবাব প্রদান করেন।[১৪]

এরপর হিজরীর দশম শতাব্দীতে ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাফেজী শী'আদের সুন্নাহবিরোধী অপতৎপরতার জবাবে 'মিফতাহুল জান্নাতি ফিল ইহতিজাজি বিস সুন্নাহ' –

❋ মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[১৩] আল মুআফাক্বাত : ৪/৩২৫-৩২৬পৃ.

[১৪] আল কুরআনিয়্যূনাল আরাব ওয়া মাওকিফুহুম ফিত তাফসীর : ৭৬পৃ. ।

(مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة) নামে এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন এবং তাতে উল্লেখ করেন :

وأصل هَذَا الرَّأْي الْفَاسِد أَن الزَّنَادِقَة وَطَائِفَة من غلاة الرافضة ذَهَبُوا إِلَى إِنْكَار الِاحْتِجَاج بِالسنةِ والاقتصار على الْقُرْآن وهم فِي ذَلِك مختلفو الْمَقَاصِد، فَمنهمْ من كَانَ يعْتَقد أَن النُّبُوَّة لعَلي وَأَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَخطَأ فِي نُزُوله إِلَى سيد الْمُرْسلين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا، وَمِنْهُم من أقرّ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالنُّبُوَّةِ وَلَكِن قَالَ: إِن الْخلَافَة كَانَت حَقًّا لعَلي فَلَمَّا عدل بهَا الصَّحَابَة عَنهُ إِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ المخذولون - لعنهم الله - كفرُوا حَيْثُ جاروا وَعدلُوا بِالْحَقِّ عَن مُسْتَحقّه، وكفَّروا - لعنهم الله - عليا رَضِي الله عَنهُ أَيْضا لعدم طلبه حَقه فبنوا على ذَلِك رد الْأَحَادِيث كلهَا لِأَنَّهَا عِنْدهم بزعمهم من رِوَايَة قوم كفار.

এ ভ্রান্ত মতের (হাদীস অস্বীকার করার) মূলে রয়েছে মুরতাদ এবং উগ্রপন্থি রাফেজী শী'আদের একটি দল, যারা সুন্নাহ দ্বারা শারঈ দলীল গ্রহণ করা অস্বীকার করে এবং শারঈ বিষয়ে শুধু করআনের ওপরই নির্ভর করে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন। তাদের অনেকেই এমন রয়েছে যারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নাবী বলে বিশ্বাস করে, তাদের দাবি হলো, জিবরীল আলাইহিস সালাম ভুল করে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ওহী নাযিল করেছে। আল্লাহ তা'আলা যালেমদের কথা থেকে অতি পবিত্র ও মহান। এদের মধ্যে আবার এমন অনেক আছে যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করলেও তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই একমাত্র খেলাফতের হক্বদার বলে বিশ্বাস করতো। যখন সাহাবাগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে খলিফা নির্ধারণ করলেন তখন এ অভিশপ্তরা বললো, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হক্ব থেকে মাহরুম করে তারা জুলুম করেছে এবং কুফরি করেছে। এরপর তারা (আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লা'নত করুন) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কেও কাফের ঘোষণা করলো। কারণ তিনি তার খেলাফতের হক্ব আদাই করেননি। (নাউযুবিল্লাহ)

আর এটাকে পুঁজি করে তারা সমস্ত হাদীস অস্বীকার করলো। তাদের দাবি হলো যারা এসব হাদীস বর্ণনা করেছে তারা সকলেই কাফের। (নাউযুবিল্লাহ)[১৫]

ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআনবাদের উৎপত্তি, তাদের বিস্তার ও ভ্রান্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

বর্তমান বা আধুনিক যুগে কুরআনবাদ :

বর্তমানে কুরআনবাদের ফেতনা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে এবং এ ফেতনা এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই কার্যক্রম চালাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য বেশকিছু দেশ, যথাক্রমে- মিসর, লেবানন, জর্ডান, ইয়েমেন ও সিরিয়াতে এ ফেতনার শক্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মিসরে কুরআনবাদের ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। এছাড়া আমাদের ভারতবর্ষ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও এ ফেতনার ভয়াবহতা দৃশ্যমান। বর্তমানের কুরআনবাদের সঙ্গে ইয়াহুদীবাদ ও নাস্তিক্যবাদের শক্ত যোগসূত্র রয়েছে। মিসর বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের কুরআনবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

মিসরে কুরআনবাদ :

কুরআনবাদের শক্ত ঘাঁটি-হিসেবে প্রসিদ্ধ মিসরের এমন অনেক গোমরাহ বিদ্যান রয়েছে যাদের লিখনী দ্বারাই পুরা মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের কুরআনবাদ ফেরকা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা তালিকা ধরে অতি বিষাক্ত কতিপয় কথিত শিক্ষিত জ্ঞানপাপীর কথা উল্লেখ করবো যাদের দ্বারা বর্তমানের কুরআনবাদ নিয়ন্ত্রিত।

মাহমুদ আবু রাইয়্যাহ :

তিনি ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেন। হাদীস অস্বীকার করা, সাহাবীদের গালিগালাজ করা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে

[১৫] মিফতাহুল জান্নাহ ফিল ইহতিজাজি বিস সুন্নাহ : ৬পৃ.

তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তার অনেক লিখনী রয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাচ্ছিল্য করেও তিনি বই লিখেছেন 'শাইখুল মুজিরাহ আবু হুরাইরাহ', যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় খাদক বা ক্ষতিকারক শাইখ আবু হুরাইরাহ!

সুন্নাহ সম্পর্কে তার বিভ্রান্তিগুলো :

১. সাহাবীগণের মাঝে কোনো আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা ছিল না। তারা মিথ্যাবাদী ও ইয়াহুদীদের ধর্মগুরু ছিল এবং তাদের কারণে ইয়াহুদীবাদের বিস্তার লাভ করেছে। (আউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

২. হাবরুল উম্মাহ-খ্যাত ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মর্যাদাকে অস্বীকার করে তাকে তাচ্ছিল্য করে সে কিতাব রচনা করেছে। তার দাবি হলো, আবু হুরাইরা শুধু পেটপূজার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি কোনো সাহাবী ছিলেন না। (আস্তাগফিরুল্লাহ)

৩. হাদীস রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় লিপিবদ্ধ হয়নি বিধায় হাদীস মানা বৈধ নয়!!।

৪. সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নয়!!।

আমরা উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত স্থানে প্রত্যেক ভ্রান্তির জবাব দিবো ইন্ শা-আল্লাহু তা'আলা।[১৬]

আহমাদ সুবহী মানসুর :

আহমাদ সুবহী মানসুর কুরআনবাদের আরো একজন বড় শাইখ। তিনি মিসরের হারীয নামক গ্রামে ১৯৪৯ সালে জন্মলাভ করেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে তিনি বড় হন। তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। এর পর তার ব্যাপক ভ্রান্তির কারণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িতও হন। এরপর ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছর অধ্যাপনা করার পর সেখান থেকে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

শারঈ বিষয় সম্পর্কে তার ভয়াবহ ভ্রান্তি :

১. কিয়ামতের দিন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো শাফাআত করতে পারবেন না।

২. নাবীগণ কোনোভাবেই নিষ্পাপ ছিলেন না।

৩. নাবী মুহাম্মাদ কোনোমতেই শ্রেষ্ঠ নাবী নন।

৪. নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর নাবী ছিলেন না।

৫. আযানে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম যুক্ত করা শির্ক। অর্থাৎ- আযানে أشهد أن لا إله إلا الله এর সাথে أشهد أن محمدا رسول الله যুক্ত করা শির্ক।

৬. তাশাহহুদে দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করা শির্ক।

৭. কুরআনবাদে সমস্ত কিছু মিথ্যা তথা সুন্নাহ বা হাদীস সবগুলো মিথ্যা এবং হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী সকলেই মিথ্যুক।

৮. হজ্বের জন্য শুধু জিলহজ মাসকে নির্দিষ্ট করা যাবে না বরং হারাম মাস তথা রজব, মুহার্‌রাম, জিলক্বদ ও জিলহজ্ব মাসের যে কোনো একটিতে হজ করলেই হজ হয়ে যাবে।

৯. কুরআনে নাসেখ মানসুখ বলতে কিছুই নেই।

১০. সে নিজেকে নাবী দাবি করতেও কার্পণ্য করেনি। তার দাবি ছিলো, তার কাছে জিবরীল ওহী নিয়ে অবতরণ করেন।

১১. কবরের আযাব বলতে কিছুই নেই।[১৭] (আউযুবিল্লাহি মিন যালিকা কুল্লিহি)

একটিবার ভাবুন তো, কত বড় শয়তান হলে এতো জঘন্য আক্বীদাহ পোষণ করতে পারে!!!!?

(চলবে- ইন্ শা-আল্লাহু তা'আলা)

[১৬] আযওয়াউ আলাস সুন্নাহ : ১০৫,১৫৩,৩১২,৩২২পৃ, আল কুরআনিয়্যুনা ফি মিসর : ১২০, ১২১পৃ.।

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তার নিজের লেখা - আল হাসাবাহ; ১৩, আল আম্বিয়াউ ফিল কুরআন : ৪০ পৃ.।

অবাক হলেও সত্য প্রতি হাজারে মাত্র একজন যাবে জান্নাতে

অধ্যাপক মো ঃ আবুল খায়ের★

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মরহুম প্রফেসর এ এইচ এম. শামসুর রহমান স্যার এবং কলারোয়ার কৃতি সন্তান ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য এবং স্ববর্জন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হাফেজ ড. মো: রফিকুল ইসলাম সাহেবের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত' পত্রিকায় কিছু লেখার নিয়ত করি। নিয়ত অনুযায়ী লিখতে লিখতে প্রায় উনষাটটি লেখা বিভিন্ন শিরোনামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মা শা-আল্লাহ। যাই হোক, একটি সত্য বিষয়; যখনই আমি কিছু বিষয়ে লেখার নিয়ত করি তখন অত্র শিরোনামটির বিষয়ে লেখার কথাই মনে হয়। লেখার প্রস্তুতিও গ্রহণ করি, কিন্তু ভয়ের কারণে আবার লেখা হতে ফিরে আসি। এ ভয় ও আতঙ্কের কারণেই অদ্যাবধি লিখতে পারিনি। তাই আজ মনের দৃঢ়তা নিয়ে অত্র শিরোনামটির বিষয়ে কিছু লিখতে চেষ্টা করছি মাত্র।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! প্রতি হাজারে মাত্র একজন জান্নাতে যাবে, আর নয়শত নিরানব্বই জনই যাবে জাহান্নামে এ ঘোষণাটি কি আতঙ্কের এবং ভয়ের কারণ নয়? এ প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি উক্তি আমাকে আরো বেশি আতঙ্কগ্রস্থ করেছে। সেটি আমি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা ইনসানিয়্যাত মাউত কে দরওয়াজে পর' বইটিতে পড়েছিলাম, তিনি বলেছেন, যদি 'আসমান হতে এমন একটি গায়েবী আওয়াজ শুনা যায় যে, একজন ব্যতীত দুনিয়ার সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে তবুও আমার ভীতি দূর হবে না। আমি মনে করবো যে, সেই হতভাগা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নয়'। অথচ 'আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন ছিলেন হযরত ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যাকে দুনিয়া থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। এ জন্য এক হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র একজন যদি জান্নাতে যায় তাহলে হযরত ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঐরূপ আমারও মনে হয়। আমি ৯৯৯ জনের মধ্যে পড়বো না তো? এ আতঙ্কটি আমাকে সর্বদা ভাবিয়ে রাখে। কিন্তু আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। একবার যদি বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা-গবেষণা করতাম তাহলে হয়ত দুনিয়ায় সর্বত্র শান্তি বিরাজ করতো। প্রশ্ন জাগে, এটি কি প্রকৃতপক্ষে সত্য, না কথার কথা! হাজারে একজন জান্নাতে যাবে, বাকী সব জাহান্নামে। এখন দেখা যাক হাদীস এবং কুরআনে এ সম্পর্কে কী বলা আছে।

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন : হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। অতঃপর উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা জাহান্নামী তাদেরকে বের কর। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার প্রতিপালক! কত হাজারের মধ্যে থেকে কত জনকে? তিনি উত্তরে বলবেন! প্রতি হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনকে। ঐ সময় গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। আর শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। মানুষকে সেদিন দেখে মাতাল মনে হবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্থ নয়। মূলত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কঠিনতম নির্দেশের কারণেই তাদের এ অবস্থা হবে। এ কথা শুনে সাহাবীদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন, ইয়াজুজ-মা'জুজের মধ্য হতে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন জান্নাতী। তোমরা লোকদের মধ্য হতে এমনই হবে যেমন সাদা রঙের গরুর কয়েকটি কালো লোম এর পার্শ্বদেশে থাকে। তারপর তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, সমস্ত জান্নাতীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক চতুর্থাংশ। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা তখন আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর দিলাম। আবার বললেন; জান্নাতীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক তৃতীয়াংশ। সাথে সাথে এবারও আমরা তাকবীর ধ্বনী পাঠ করলাম। এরপর তিনি আবার বললেন; তোমরাই হবে জান্নাতীদের অর্ধাংশ। আমরা এবারও তাকবীর ধ্বনী পাঠ করলাম।"[১৮]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! কিয়ামতের পূর্বে জমিনের ভয়ঙ্কর এ প্রকম্পনের ফলে মানুষের যে কী অবস্থা সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমের একাধিক সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা আল-হাজ্জ এর ১- ২ নং আয়াতে, সূরা ওয়াকিয়ার ৪-৫ নং আয়াতে, সূরা আয-যিলযাল ১-৪ নং আয়াত, সূরা আন-নাযি'আতের ৬-৮ নং আয়াত ইত্যাদি। এর মধ্যে সূরা

★ সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া। সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

[১৮] সহীহ বুখারী হা : ৪৭৪১, ৬৫৩০, ৭৪৮৩, সহীহ মুসলিম হা : ২০২২

আল-হাজ্জ এর প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবেই বলেন :

অর্থাৎ : হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্থ অবস্থায়, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। মূলত সেদিন জমিনে এত ভয়ঙ্কর প্রকম্পন সৃষ্টি হবে যে, তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই বের করে দেবে, যেমন- মানুষ খনিজ ও প্রোথিত সম্পদ সবই। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : জমিন তার কলিজার টুকরোগুলোকে উগরে দেবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপের আকারে বাইরে বেরিয়ে পড়বে। এসব দৃশ্য দেখে হত্যাকারী বলবে, হায়! আমি এ সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছি, অথচ আজ এগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে; কেউ এগুলোর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারকারী দুঃখ করে বলবে, হায়! এ সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করিনি। চোর বলবে, হায়! এ সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এগুলো তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবে না।[১৯]

জমিনের এ অবস্থা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলবে, জমিনের কী হল! কারণ ইতঃপূর্বে তারা এমন অবস্থা কখনও দেখেনি। জমিনের ওপর মানুষ যা করেছে সবই বলে দেবে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন 'তুহাদ্দিসু আখবারাহা' সূরা আয-যিলযাল-এর আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বললেন : তোমরা কী জানো, জমিনের খবর কী? সবাই বলল, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ অধিক জানেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন, জমিনের সংবাদ হলো; প্রত্যেক নর-নারী জমিনের ওপর যা কিছু করেছে সবকিছু বলে দেবে। জমিন বলবে; অমুক অমুক কাজ অমুক দিন করেছে। এটাই হলো জমিনের সংবাদ।[২০]

আওহালাহা অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মাটিকে কথা বলার শক্তি দেবেন। শুধু তাই না, সেদিন মানুষের ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে। এমনকি জড় পদার্থেরও কথা বলা, শব্দ ধরে রাখা এবং প্রয়োজনে তা শুনিয়ে দেয়ার ক্ষমতাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেবেন। যা আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! জান্নাতে প্রতি হাজারে একজন যাবে, কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং মানুষের কৃতকর্মের হিসাব পাই টু পাই দেয়া লাগবে এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কিয়ামত সংঘটিত হবে এটিকে কেউ রোধ করতে পারবে না, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সূরার মধ্যে স্পষ্ট করে ঘোষণাও করেছেন। যেমন সূরা নিসার ৮৭ নং আয়াতে বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

আবার সূরা হাজ্জ এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : এবং কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্থিত করবেন। সূরা শূরা ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে- যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোধ্য। অতএব কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, কিয়ামত সংঘটিত হলে পৃথিবীতে কী কী হবে সেটিও আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। যেমন সূরা আল ক্বারিআহ ৫ নং আয়াতে বলেছেন : 'এবং পর্বতমালা হবে ধূণিত রঙীন পশমের মতো'। আবার সূরা মুযযাম্মিল ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পবর্তসমূহ বহমান বালুকারাশির ন্যায় হবে।'

অবশ্য মহান রাব্বুল আলামীন সূরা আয-যিলযাল এর ৭ নং ৮ নং আয়াতে বলেছেন : কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। অন্যদিকে রাসূল ﷺ বলেছেন, দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং আনন্দিত হও এবং আমল করতে থাকো; যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, তোমাদের সাথে দুটি মাখলুক রয়েছে, যাদের সংখ্যা তোমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তারা হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। এছাড়া বনী আদম এবং ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা ইতঃপূর্বে মারা গেছে। জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে, মুনাফিকরাও রয়েছে।

অতএব সংখ্যার দিকে লক্ষ্য না করে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে একটাই প্রার্থনা, বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আমরা যেন তোমার দ্বীনের পথে অটুট থেকে সঠিক ও সৎ আমল করতে পারি সেই তাওফীক দান করুন, আমীন।❑❑

[১৯] সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হা : ২২০৮।
[২০] তিরমিযী হা : ৩৩৫৩ সহীহ।

বিদায়ী রামাযান : আত্মশুদ্ধির কী শিক্ষা রেখে গেল?

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ *

ভূমিকা : রামাযান মাস মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক অনন্য ও বরকতময় সময়। এটি শুধুমাত্র খাদ্য ও পান থেকে বিরত থাকার মাস নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি, চরিত্র পরিশুদ্ধ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশিক্ষণকাল। পুরো মাসজুড়ে একজন বান্দা ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যা তার অন্তরে আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া জাগ্রত করে এবং চরিত্রকে পরিপূর্ণ করে। বিদায়ী রামাযান আমাদেরকে শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার শিক্ষা নয়, বরং চরিত্র পরিশুদ্ধি, আত্মসংযম, দানশীলতা, কুরআনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক এবং সামাজিক ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়ে যায়। এ মাস শেষ হওয়ার পর আমাদের প্রতিফলিত করতে হবে- আমরা কতটুকু তার শিক্ষা বাস্তব জীবনে ধারণ করতে পেরেছি এবং কিভাবে তা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং, বিদায়ী রামাযান শুধু শেষ হওয়া মাসের নাম নয়; এটি একটি প্রতিফলন, আত্মসমীক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণার সময়। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো- এসব শিক্ষাকে শুধু মনে রাখা নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনধারায় রূপান্তরিত করা। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১। তাক্বওয়া অর্জন : রমাযানের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া অর্জন করা। তাক্বওয়া মানে হলো আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। সিয়াম শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার নাম নয়, বরং এটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।"[২১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়াবান।"[২২] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপাচার পরিহার করল না, তার পানাহার পরিহার করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[২৩] এটি প্রমাণ করে যে, সিয়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। সিয়াম পালনের মাধ্যমে যদি তাক্বওয়া অর্জিত না হয়, তাহলে সে সিয়াম পালন করা আর না করা সমান অর্থাৎ মূল্যহীন।

২। আত্মসংযম ও সচ্চরিত্র গঠন : রামাযান মানুষের মধ্যে আত্মসংযম, ধৈর্য্য এবং সহনশীলতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার মাধ্যমে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ -مَرَّتَيْنِ- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا .

"সিয়াম ঢাল-স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দু'বার বলে, আমি সওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান

* আক্বীদাহ ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

[২১] সূরা আল-বাকারাহ আয়াত : ২/১৮৩।
[২২] সূরা আল-হুজরাত আয়াত : ১৩।
[২৩] সহীহ বুখারী হা : ১৯০৩।

করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশগুণ।"[২৪] এ মাসে সিয়াম পালনকারীকে রাগ, হিংসা, মিথ্যা, গীবত ও অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকা শেখানো হয়। প্রতিটি সিয়াম পালনকারীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ .

"সিয়ামের দিনে তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে।"[২৫] সুতরাং বুঝা গেল, রামাযান সিয়াম পালনকারীর চরিত্র ও সামাজিক আচরণকে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। মিথ্যাচার ও পাপমুক্ত জীবন যাপন : মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা বা নিষিদ্ধ কর্মের দিকে ঝোঁক বেশি। যেমন প্রবাদে বলা হয়, اَلْإِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِيْمَا مُنِعَ "মানুষ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়।" আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে সিয়াম মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। কেননা মানুষ সিয়ামরত অবস্থায় কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হলে তার সিয়ামের কোনো মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপাচার পরিহার করল না, তার পানাহার পরিহার করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[২৬] আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو .

"খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, বাতিল ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার নামই প্রকৃত সিয়াম।"[২৭] সিয়াম শুধুমাত্র খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নাম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক অনুশীলন, যা মানুষের কথাবার্তা, কাজকর্ম, মনোভাবকে আল্লাহর বিধান অনুসারে শুদ্ধ করে। যদি কেউ সিয়ামরত অবস্থায় পাপের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তার সিয়ামের কোনো প্রকৃত মূল্য নেই। সুতরাং, সত্য ও পাপমুক্ত জীবন যাপন হল প্রকৃত সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য।

৪। কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন : রামাযান মাস মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। এ মাসের বিশেষ মর্যাদার অন্যতম কারণ হলো- এ মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াত, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ "রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ।"[২৮] তাই রামাযান আমাদেরকে কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়। এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত, এর অর্থ ও শিক্ষা অনুধাবন এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে।

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার প্রথম ধাপ হলো নিয়মিত তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত করলে মানুষের অন্তর প্রশান্ত হয় এবং ঈমান শক্তিশালী হয়। রামাযান মাসে মুসলিমরা বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে থাকে, যাতে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ করা যায়। কিন্তু কেবল তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট নয়; কুরআনের অর্থ বোঝা এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও অত্যন্ত জরুরি। যখন মানুষ কুরআনের বাণী বুঝে পড়ে, তখন তা তার চিন্তা, চরিত্র ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও রামাযান মাসে কুরআনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থাকতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, وكان يَلقاه في كُلِّ لَيلةٍ مِن رَمَضانَ فيُدارِسُه القُرآنَ "রমাযানের প্রতি রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরআন পাঠ ও আলোচনা করতেন।"[২৯] এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পাই যে, কুরআন অধ্যয়ন, শোনা ও বোঝার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। এটি শুধু রমাযানের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সারা জীবনের জন্য একটি নিয়মিত আমল হওয়া উচিত।

[২৪] সহীহ বুখারী হা : ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম হা : ১১৫১।
[২৫] সহীহ বুখারী হা : ৫৯২৭।
[২৬] সহীহ বুখারী হা : ১৯০৩।
[২৭] শু'আবুল ঈমান ৩/৩১৭, ৩৬৪৮।
[২৮] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫।
[২৯] সহীহ বুখারী হা : ৩২২০।

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কুরআন কেবল পাঠের জন্য নয়; এটি মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নাযিল হয়েছে। তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের চরিত্র, আচরণ ও জীবনধারা গঠন করা। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য্য, দয়া ও পরোপকারের মতো গুণাবলী কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবনে বিকশিত হয়। সুতরাং কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫। অধিক পরিমাণে দান-সদকা : রামাযান মাস মুসলিমদের জন্য ইবাদত, সংযম ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়ার একটি বিশেষ সময়। এ মাসে সিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব করে। এর ফলে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনযাত্রার কষ্ট উপলব্ধি করা সহজ হয় এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। তাই রামাযান মানুষকে অধিক পরিমাণে দান-সদকা করার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলামে দান-সদকার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, বিশেষ করে রামাযান মাসে এর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দানশীলতার ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানশীল এবং রামাযান মাসে আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন।"[৩০] তিনি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসতেন। তাঁর এ আদর্শ অনুসরণ করে মুসলিমদেরও রামাযানে বেশি বেশি দান-সদকা করা উচিত। সুতরাং রামাযান মাস মানুষকে দানশীলতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। এ শিক্ষা যদি সারা বছর অনুসরণ করা যায়, তবে সমাজে দারিদ্র্য কমবে এবং একটি সহানুভূতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে।

৬। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা প্রদর্শন : রামাযান আগমন করে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একই বিধান পালন করি এবং একে অপরের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যাই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّـذِيْ خَلَقَكُـمْ مِّـنْ نَفْـسٍ وَّاحِـدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَـالاً كَثِـيْرًا وَّنِـسَاءَ وَاتَّقُـوا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদ্বীয় স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"[৩১] সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা একে অপরের ভাই এবং এ ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের সামনে আগমন করে রামাযান মাস। এ মাসে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে এবং এক মনে ইবাদতে সময় ব্যয় করে।

৭। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকা : রামাযান মাস মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও নফস নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ মাসে সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত থাকে। এর ফলে মানুষ আত্মসংযম, ধৈর্য্য ও তাক্বওয়া অর্জনের শিক্ষা লাভ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে যে, জীবনের সব ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা উচিত নয়। সিয়াম মানুষের খারাপ প্রবৃত্তি যেমন লোভ, ক্রোধ, মিথ্যা কথা, গীবত ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। ফলে মানুষের চরিত্র পরিশুদ্ধ হয় এবং সে নৈতিকভাবে উন্নত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ٱلصِّيامُ وَٱلْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ فِي للعَبْدِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَقُولُ ٱلصِّيامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ ٱلطَّعَامَ وَٱلشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ ٱلْقُـرْآنُ: مَنَعْتُـهُ ٱلنَّوْمَ بِٱللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشْفَعَانِ

[৩০] সহীহ বুখারী হা : ৪৯৯৭।

[৩১] সূরা আন-নিসা আয়াত: ১।

"ক্বিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে খাদ্য গ্রহণ ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রিতে ঘুমানো থেকে নিবৃত্ত করেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন তাদের দু'জনেরই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"[৩২] অতএব, রামাযান মাস মানুষকে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয় এবং তাকে তাক্বওয়াবান ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৮। ইবাদতে নিয়মিত হওয়া : ইবাদতে নিয়মিত হওয়া একজন মুসলিমের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। রামাযান মাস আমাদেরকে ইবাদতের প্রতি অভ্যস্ত হতে শেখায়। এ মাসে আমরা নিয়মিত সালাত আদায় করি, কুরআন তিলাওয়াত করি, দু'আ ও ইস্তিগফার করি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করি। এর ফলে আমাদের হৃদয়ে ধারাবাহিক ইবাদতের সুন্দর অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা শুধু রমাযানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সারা বছর আমাদের জীবন আলোকিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"[৩৩] ইবাদতের ক্ষেত্রে পরিমাণের চেয়ে ধারাবাহিকতা বেশি মূল্যবান। অল্প হলেও নিয়মিত আমল আমাদের আত্মাকে আলোকিত করে এবং ঈমানকে শক্তিশালী করে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো আদায় করা, প্রতিদিন কিছু কুরআন পাঠ করা, নিয়মিত দু'আ ও যিকর করা-এসব ছোট ছোট কাজই আমাদের জীবনে বড় পরিবর্তন আনে। রামাযান মাসে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ইবাদতে বেশি মনোযোগ দেই। তবে রমাযানের আসল শিক্ষা হলো এ অভ্যাসকে মাস শেষে ও বছরের বাকি সময়েও চালিয়ে যাওয়া। ইবাদতে ধারাবাহিক থাকার জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা, সৎ মানুষের সঙ্গ এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা জরুরি।

৯। তাওবাহ ও ক্ষমা লাভের মাধ্যম : রামাযান কেবল খাদ্য ও পানির থেকে সংযমের মাস নয়, এটি মানব জীবনে তাওবাহ, আত্মপরিশুদ্ধ এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসার মাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম রাখে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়।"[৩৪] রামাযান ঈমানদারদের জন্য একটি নতুন সুযোগ, যা অতীতের ভুল মুছে দেয় এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা জোগায়। তাওবাহ হলো আল্লাহর কাছে ফিরে এসে নিজের গুনাহ স্বীকার করা, তা পুনরায় না করার সংকল্প করা এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। রামাযান আমাদের শেখায় আত্মসমালোচনা করা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং দু'আ ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। এ শিক্ষা কেবল মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে এটি প্রয়োগ করা জরুরি। ধৈর্য্য, সংযম, আত্মউন্নয়ন এবং ক্ষমাশীল হওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম রামাযানকে বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারে এবং সৎ, আল্লাহভীরু জীবনযাপন করতে পারে।

উপসংহার : বিদায়ী রামাযান শুধু একটি মাস শেষ হওয়ার সংকেত নয়, বরং এটি আমাদের জন্য একটি আত্মমূল্যায়নের সময়ও। এ মাসটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রমাযানের প্রকৃত শিক্ষা কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে ধার্মিক, মানবিক ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সিয়াম আমাদের শেখায় ধৈর্য্য ধারণ করা, আত্মসংযমে স্থিত থাকা এবং ত্রুটিপূর্ণ আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। সুতরাং বিদায়ী রামাযান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রামাযান একটি প্রেরণার উৎস, যা আমাদেরকে আত্মসংযম, দানশীলতা এবং ধার্মিকতার পথে চালিত করে। যদি আমরা এসব শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করি, আমরা কেবল আল্লাহর নৈকট্যই অর্জন করব না, বরং আমাদের জীবন হবে আরো সচেতন, পরিপূর্ণ এবং সত্যিকারের অর্থে পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ এসব শিক্ষা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন।❑❑

[৩২] মিশকাতুল মাসাবীহ হা : ১৯৬৩।
[৩৩] সহীহ বুখারী হা : ৬৪৬৪।
[৩৪] সহীহ বুখারী হা : ৩৮।

ধনী গরীব সমাচার

সাইদুর রহমান*

মধ্যবয়সী এক লোক। ছিপছিপে গড়নের। নিম্নবিত্ত পরিবারে তার বসবাস। সংসারের ঘানি টানতে টানতে তার শক্তপোক্ত কাঁধটা ন্যুব্জপ্রায়।

সুখের হাতছানি পাওয়ার প্রত্যাশায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম খাটুনিতে লিপ্ত। দিনের প্রথম পর্বে ঘর থেকে বের হয়। ফিরে আসে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা। দিন যায়, মাস যায়, এভাবে কাটে তার প্রহর। কোনোভাবেই তার দরিদ্র্যতা বিদূরীত হচ্ছে না। দরিদ্র্যতার কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত তার তনুমন। নাহ! এভাবে কি আর যায়? মনে মনে ভাবে, আল্লাহ কেন আমাকে সৃষ্টি করলেন? কত কষ্টের মাঝে আছি! আশপাশের কিছু লোকের উন্নতি অগ্রগতি দেখে তার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বিড়বিড় করে বলে, 'আল্লাহ সকল মানুষকে ধনী করলেই পারতেন। কিছু মানুষকে নিঃস্ব করলেন কেন? কেন তাদের কষ্ট দিচ্ছেন? হাজার প্রশ্নের ঝুড়ি তার সামনে হাজির হয়। কোনো এক গোধূলি বেলার কথা। দুর্বল দেহ নিয়ে আজ একটু আগেভাগেই চলে এসেছে। প্রাণ আসে যায়। রাতের খাবার কোনো মতো খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাতে সে স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করে। কাঙ্ক্ষিত এক স্বপ্ন ধরা দেয় তার তরে। স্বপ্নে দেখে, তার ফোনে একটা মেসেজ এসেছে। অবচেতন মনেই হাতটা চলে যায় ফোনে। ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে হতবাক! স্ক্রিনে ভেসে ওঠে তার যাপিত জীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তুর ছবি।

'পঞ্চাশ লাখ টাকা তার ফোনে এসেছে'! এসময় কি আর চোখের কোণে ঘুম লুকিয়ে থাকে? হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ে। চোখ ডলতে থাকে। স্বপ্ন দেখছে, নাকি বাস্তব? দোটানার রেষ ভাঙল এবার। সত্যি সত্যিই ফোনে পঞ্চাশ লাখ টাকা এসেছে। তার চোখ কপালে চড়লো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এ আনন্দের কথা কার সাথে বলবে। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে পাশেই শুয়ে থাকা স্ত্রীকে মৃদু আলতো করে ডাক দেয়,

'এই শুনছো, এই যে সাদিয়া'! 'তুমি এতো রাতে চেঁচিয়ে উঠছো কেন'? 'আরে শুনো, খুশির খবর। আমার সারাজীবনের আরাধ্য বস্তু পেয়েছি'!!

'ফোনে পঞ্চাশ হাজার টাকা এসেছে'। হা, হা, হা,,,,,

আমার মনে যে কী আনন্দ লাগছে!

এখন আমাদের আর এত্ত কষ্ট করতে হবে না'। জানো সাদিয়া, আমার যে কেমন লাগছে তোমাকে বুঝাতে পারবো না! সাদিয়া মুখের ওপর বলে দিল, 'এতে আনন্দের কী আছে! আমার ফোনেও তো ঘন্টাখানেক আগে পঞ্চাশ লাখ টাকা এসেছে'।

মুহূর্তেই তার হাসিখুশি চেহারায় মলিনতার ঝাপটা আঘাত হানে। চোখ বড় বড় করে বলে, 'কী বলছো এগুলো, সত্যিই নাকি'?

'হ্যাঁ গো সত্যি'। 'তাহলে তো ভালোই। আজ থেকে আমরা ধনী হয়ে গেলাম'।

রাতের প্রহর শেষ। দিনের প্রথম পর্বের সূর্য ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। রীতিমতো কাঁধে একটা গামছা ঝুলিয়ে ছুটছে বাজারের পথ ধরে। এ খুশির সুবাদে মানুষকে মিষ্টিমুখ করাবে।

হায় হায়! রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। প্রতিদিনের ন্যায় আজ রিকশাচালকদের কোলাহল নেই। এ স্থান প্রতিদিন রিকশাচালকদের হৈ চৈয়ে মুখরিত হয়ে থাকে। আজ এতো বেলা গড়ালো, তথাপি লোকজনের হদিস মিলছে না! সে খানিকটা বিস্ময়বোধ করলো আর মনে মনে বললো, 'কাজের সময় শালার মানুষ পাওয়া যায় না'। অগত্যা পাশের বাড়ির রিকশাচালক কুদ্দুস মিয়ার বাড়িতে গিয়ে সজোরে হাঁক ছাড়ল, 'কুদ্দুস, এই কুদ্দুস'!

চোখ কচলাতে কচলাতে অন্দর মহল থেকে কুদ্দুস মিয়া বের হয়ে আসে। 'কী হয়েছে চাচা'?

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

‘কী আশ্চর্য! এত্তো বেলা হয়ে গেছে, এখনো তুই ঘুমাস? তোরা কী করে খাবি! রিক্সা বের কর, বাজারে যামু’।

‘ইয়ে... মানে, চাচা’!

‘এতো মানে মানে করস ক্যান! তাড়াতাড়ি আয়, একটু তাড়া আছে’।

চাচা, ‘আমি তো রিকশাা চালানো ছেড়ে দিয়েছি’।

‘বলিস কী এগুলো! এখন কী করে চলবি? আর কেনই বা ছাড়লি’?

‘শখে কী আর ছাড়ছি চাচা! গতকাল রাতে দেহি আমার ফোনে পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা মেসেজ এসেছে! খুশির চোটে আমি তো স্বপ্নের রাজ্যে দোল খেতে লাগলাম! রাতেই পণ করেছি আর রিকশা-টিকশা চালামু না। এহন থেইক্যা নবাবীর হালতে চলমু। বহুদিন পর আল্লাহ আমার দিকে তাকাইছে’।

কুদ্দুস মিয়ার কথা শুনে তো বেচারা লা-জাওয়াব। উপায়ান্তর না পেয়ে পায়ের বাহনে ছুটে বাজার পানে। কী আশ্চর্য! আজ মানুষের আনাগোনা নেই কেন? নগরজীবন ছেড়ে সবাই গেল কোথায়? বাজারের অদূরে আবর্জনা ফেলার একটা জায়গা আছে। প্রত্যেকদিন ভোরের পাখি জাগার আগেই এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা এসে সব আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলে। কোনো দুর্গন্ধের অস্তিত্ব থাকে না। আজ কারো দেখা মিলছে না। আবর্জনা থেকে কী বিশ্রী গন্ধ আসছে। নাক-মুখ চেপে ধরে মিষ্টির দোকানের সন্নিকটে গেল।

দোকানের সাটার লাগানো। বাইরে তালা ঝুলছে। রীতিমতো আশপাশে মাছিরা ভনভন করছে। হায় আল্লাহ! দোকান বন্ধ! মিষ্টি না পেয়ে কিছু টাটকা সবজি কেনার মানসে সবজির দোকানের দিকে পা বাড়ালো। এসব দোকানও ফাঁকা পড়ে আছে। সদ্য জাগা কাকগুলো সজোরে হাঁকডাক দিচ্ছে।

মনের অগোচরে তার হাতটা গোঁফের তল্লাটে চলে যায়। এতো ধারধার লাগছে কেন? গোঁফও তো দেখা যায় বেশ বড় হয়ে গেছে! একটু ছোট করতে হবে। যাক ভালোই হলো, বাজারে আছি গোঁফ ছেঁটেই নেই। গুটি গুটি পায়ে সেলুনের দোকানের সামনে যায়। ওই দোকানও বন্ধ।

বাজারে হুট করে বড় মেয়ে আঁখির কথা মনে পড়ে। বেচারী মেয়েটা কিছুদিন পূর্বে নতুন জামার জন্য বায়না ধরেছিল। তখন টাকা পয়সা ছিল না। গরীবের সংসারে শখ আহ্লাদ পূরণ করাও মুশকিল। এখন যেহেতু পকেট ভর্তি টাকা আছে এ সুবাদে তার জন্য একটা ফ্রক নিয়ে নেই।

বিপণীবিতানগুলো সবজির দোকান থেকে খানিকটা ভেতরে। হেঁটে যেতে দু-এক মিনিট লাগে। জোড়া পায়ে তড়িৎ হেঁটে গেল। গিয়ে তো অবাক! কাপড়ের দোকান বন্ধ। সারা বাজার-ই আজ বন্ধ। মৃত্যুপুরীর রূপ ধারণ করেছে।

দীর্ঘক্ষণ একাকী ঘোরাঘুরি করলো। সূর্যটা বরাবরের মতো কপালের ভাঁজে এসে পড়ছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। দশটা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছালো। বাড়িতে গিয়ে তার বউকে পেল না। মনটাই খারাপ। ধ্যাৎ! এই অসময়ে সাদিয়া কোথায় গেল। একটু পর তার বউ সাদিয়া হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

‘কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এই অবেলায় পাড়া বেড়ানোর বদঅভ্যাস তোমার আজ অবধি গেল না। তাড়াতাড়ি ভাত দাও। খুব খিদে পেয়েছে’।

‘এই, শুনছেন’? ‘কী হয়েছে’! ‘গতরাতে নাকি পাড়ার সকল লোকের ফোনে আমাদের মতো পঞ্চাশ হাজার টাকা এসেছে’। ‘কী বলছো এগুলো আবোল-তাবোল? অদ্ভুত কাণ্ড! ‘আরে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমি সত্যিই বলছি। পাড়ার সবাই তো তা-ই বলাবলি করছে। আমি তা শুনতেই গিয়েছিলাম’।

‘ও আচ্ছা, এই তাহলে কাণ্ড! আগে ভাত দাও তো, পরে দেখা যাবে কী হয়েছে না হয়েছে’! ‘হায় আল্লাহ! কোত্থেকে আপনাকে ভাত দিবো, ঘরে তো একমুঠো চালও নেই’?

‘চাল নেই তো তুমি আমাকে এখন বলছো কেন? সকালে বলতে। আমি বাজার থেকে কিনে আনতাম’।

‘আমাকে বলার মতো সময় তো দিতে হবে জনাব। আপনি তো এই যে ফজরের পর বের হয়েছেন, এর পর থেকে লা-পাত্তা। যাওয়ার সময় কি আমাকে বলে বের হয়েছেন’?

‘আচ্ছা ঠিক আছে। চালের ব্যাগটা দাও। আমি বাবুলের দোকান থেকে চাল নিয়ে আসি’। পনেরো বিশ কদম হেঁটে বাবুলের দোকানে যায়। গিয়ে দেখে তার দোকান বন্ধ। দোকানের পাশ ঘেঁষেই তার বাড়ি। বাড়িতে হাঁক ছাড়লো, ‘বাবুল, বাড়িতে আছো’? ‘কী হয়েছে চাচা’? ‘তোমার দোকান খুলবা না? কয়েক কেজি চালের দরকার’। চাচা, আসলে আমি দোকানদারি ছেড়ে দিয়েছি। গতরাতে আমার ফোনে ‘পঞ্চাশ হাজার টাকা’র একটা মেসেজ এসেছে। কষ্ট করতে ভালো লাগে না’।

তার ফোনেও যে পঞ্চাশ লাখ টাকা এসেছে একথাটা গোপন করে চুপ করে বাসায় চলে আসে। খালি হাত দেখে সাদিয়া চট করে বলে উঠলো, ‘চাল কোথায়’? আসলে সাদিয়া, বাবুল তো দোকানদারি ছেড়ে দিয়েছে। আজ চলো আমরা মুড়ি খেয়ে থাকবো’। ‘বেশ তো ভালো কথা; কিন্তু মেয়েরা কী খাবে’? ‘তারাও আমাদের সাথে মুড়িই খাবে’।

‘ঠিক আছে তাহলে’।

দুপুরে মুড়ি আর গুঁড় খেয়ে কোনো মতে বিকেল গড়িয়ে এলো। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে খাবারের সন্ধ্যানে হন্যে হয়ে ঘুরছে; কিন্তু কোনো খাবারও মিলছে না। শূন্য হাতে সন্ধ্যার পর ফিরে আসে। সাদিয়া বললো, ‘কী গো কিছু পেলে’? মুখটা ভার করে সে বললো, ‘নাহ’। ‘রাতে তাহলে কী খাবো? আমরা বেন না খেয়ে থাকতে পারবো; কিন্তু মেয়েরা’? তার হৃদয়ের অভিধানে বলার মতো কোনো শব্দ নেই।

এশার সালাত পড়ে পেটপূর্তি করে পানি খেয়ে শুয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, প্রত্যেকদিন টাকার অভাবে কিছু আনতে পারি না। আর আজ পকেটভর্তি টাকা; তথাপি খাবার কিনতে পারছি না। এ কল্পনা করতে করতে কোন সময় যে চোখের রাজ্যে ঘুম এসে ভিড় জমায় টেরই পায়নি।

মধ্যরাত। পৃথিবী নিস্তব্ধ। প্রকৃতি মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন সময় আচমকা তার ঘুম ভেঙে যায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় দু’চোখ থেকে ঘুম উধাও। কোনোভাবেই ঘুম আসছে না। অগত্যা উঠেই পড়লো। বাহিরে বের হয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলো। ভেবে পাচ্ছে না, কী করবে! কী ভেবে না ভেবে ফের এসে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে পড়লে কী লাভ, ঘুম তো আসতে হবে নাকি! এপাশ ওপাশ হচ্ছে শুধু। একপর্যায়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ফজরের নামাজের সময় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। গোটা ঘরদোর মাতিয়ে তোলে। শিশুরা যেভাবে কাঁদে হুবহু একই ধাঁচ। ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সাদিয়াও ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তারও ভীষণ ক্ষুধা লাগে। কিন্তু সে আড়াল করে রাখে। মেয়ে আঁখিও ঘুম থেকে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে। আঁখি কাকুতিভরা কণ্ঠে আবদার করে, ‘বাবা কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো না। আমি তো ক্ষুধার জ্বালায় মরে যাবো’।

চোখ দুটো ছলছল করছে। জলভরা নয়নে শুধু তাকিয়ে রইল। বলার মতো কোনো ভাষা নেই। আজ পকেটভর্তি টাকা থাকা সত্ত্বেও খাবার নেই। অঝোরে তার নয়ন দিয়ে শ্রাবণের ধারা বইছিল। কান্নার দরূণ হেঁচকি উঠে গেল।

রাত তিনটা বেজে কুড়ি মিনিট। মধ্যবয়সী লোকটি ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠে। চোখ কচলাতে থাকে। কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম! টেবিলের উপরে থাকা গ্লাসভর্তি পানি ডগডগ করে গলধঃকরণ করে। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলে। হায়! কী স্বপ্ন দেখলাম! চুপটি মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকে। ভাবনার চাদর উল্টিয়ে দেয়। এজন্যই তো আল্লাহ তা‘আলা ধনী-গরীবের একটা তফাৎ করেছেন। পৃথিবীতে সবাই যদি ধনী হতো তাহলে কেউ তো কারো দ্বারস্থ হতো না। এটাই আল্লাহর রীতি। আসলে আমরা না জেনে না বুঝে আল্লাহকে দোষারোপ করি। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

পহেলা বৈশাখ : বাংলার সংস্কৃতির বিকৃতি

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

একটি জাতির সংস্কৃতি তার বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ইতিহাসের প্রতিফলন। বাঙালির নববর্ষ উদযাপন ঐতিহাসিকভাবে একটি কৃষিভিত্তিক ও কর আদায়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া (ফসলি সন) হিসেবে শুরু হলেও বর্তমানে এর সাথে এমন কিছু অনুষঙ্গ যুক্ত করা হয়েছে, যা মূল ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে আধুনিক উদযাপনে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ, মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো মূর্তিনির্ভর আচারের অনুপ্রবেশ এবং বল্গাহীন অপসংস্কৃতির চর্চা একে প্রকৃত বাঙালি ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যে কোনো উৎসবের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং শালীনতা। কিন্তু বর্তমান পহেলা বৈশাখের অনেক আচারে শির্ক (আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা) এবং বিজাতীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছে, যা মুসলিম প্রধান এ দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্মীয় চেতনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ফলে তথাকথিত এ আধুনিক উদযাপন বাংলার শাশ্বত সংস্কৃতির বিকাশ নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত 'সাংস্কৃতিক বিকৃতি' হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছে।

বাংলা সংস্কৃতির সূচনা : বাংলা সংস্কৃতির সূচনা কোনো একক সময় বা একক ঘটনার মাধ্যমে হয়নি; বরং এটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান বাংলা অঞ্চলে নানা জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, তিব্বত-বর্মী ও আর্যসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির সমন্বয়ে এখানে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। নদীমাতৃক পরিবেশ, কৃষিনির্ভর জীবনযাপন এবং ঋতুচক্রভিত্তিক দৈনন্দিন অভ্যাসও এ সংস্কৃতির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালে প্রাচীন বাংলায় নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং বাণিজ্য, কারুশিল্প ও সামাজিক সংগঠন শক্তিশালী হতে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ভাষার বিকাশ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত, অপভ্রংশ হয়ে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং এ ভাষাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, লোককথা, সংগীত, প্রবাদ-প্রবচন ও আচার-অনুষ্ঠানের একটি বিস্তৃত জগৎ তৈরি হয়, যা বাংলা সংস্কৃতিকে সুসংহত রূপ দেয়। পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাংলা অঞ্চলের শিক্ষা, স্থাপত্য ও চিন্তাধারায় বিশেষ ছাপ ফেলে এবং পরে সেন যুগে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ইসলামের আগমনের পর। মুসলিম শাসনামলে প্রশাসন, শিক্ষা, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনে নতুন ধারা সূচিত হয় এবং সুফি সাধকদের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় ন্যায়, সাম্য, মানবতা ও ধর্মীয় নৈতিকতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে। এর ফলে বাংলা সংস্কৃতি আরো সমন্বিত ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে।

গ্রামীণ সমাজের জীবনধারা বাংলা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর ছিল। কৃষিকাজ, নদীপথে যাতায়াত, মৌসুমি উৎসব, পারিবারিক ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং লোকজ ঐতিহ্যের ধারাবাহিক চর্চা বাংলার মানুষের সামাজিক পরিচয়কে সুদৃঢ় করে। এভাবে বহু শতাব্দীর সামাজিক, ভাষাগত, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক প্রভাবের সম্মিলনে ধীরে ধীরে বাংলা সংস্কৃতির সূচনা ও বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে।[৩৫]

ইসলাম ও বাংলা সংস্কৃতির তফাৎ : ইসলাম একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা-যার ভিত্তি আল্লাহপ্রদত্ত ওহী, কুরআন ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে বাংলা সংস্কৃতি একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল, যা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্মীয় প্রভাব ও ভৌগোলিক বাস্তবতার সম্মিলনে গড়ে উঠেছে। তাই ইসলাম ও বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে-উৎস, লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের দিক থেকে। এই পার্থক্য বোঝা একজন সচেতন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের উৎস মানবনির্মিত নয়; বরং তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে-

* মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[৩৫] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা একাডেমি, (পৃষ্ঠা : ৪২)

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণা করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৩৬]

এ আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামের বিধান কোনো জাতিগত বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা সার্বজনীন ও চিরন্তন। অন্যদিকে বাংলা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বহু ঐতিহাসিক ধাপ অতিক্রম করে। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠন প্রাচীন স্থানীয় জনজাতি, আর্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাবের সম্মিলিত ধারায় বিকশিত হয়েছে (পৃষ্ঠা : ৫৫-১২০)। এতে বোঝা যায়, বাংলা সংস্কৃতি একটি পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক বাস্তবতা, কিন্তু ইসলাম একটি অপরিবর্তনীয় ঐশী বিধান।

ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করা। আল্লাহ বলেন-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।"[৩৭]

এ ঘোষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ইবাদত ও তাকওয়া। পক্ষান্তরে বাংলা সংস্কৃতির লক্ষ্য মূলত সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লোকজ রীতি বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের বিকাশ। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলার সংস্কৃতি নদীনির্ভর কৃষিজীবন, মৌসুমি উৎসব এবং গ্রামীণ সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে (পৃষ্ঠা : ১-৩০)। এতে বোঝা যায় বাংলা সংস্কৃতির ভিত্তি ধর্মীয় ওহী নয়; বরং সামাজিক অভিজ্ঞতা।

ইসলামে উৎসবের ধারণাও নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন,

"আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দুই দিনের পরিবর্তে উত্তম দুই দিন নির্ধারণ করেছেন; ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।"[৩৮]

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমের উৎসব নির্ধারিত এবং তা ওহীভিত্তিক। অন্যদিকে বাংলা সংস্কৃতিতে বিভিন্ন মৌসুমি ও সামাজিক উৎসব রয়েছে, যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে কৃষিনির্ভর জীবন ও লোকজ ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ আহমদ শরীফ তাঁর বাঙালীর সংস্কৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলার উৎসবসমূহ মূলত কৃষিভিত্তিক সমাজ ও ঋতুচক্রের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত (পৃষ্ঠা : ৭৮-৯৫)। ফলে উৎসবের উৎস ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেও ইসলাম ও বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।

ইসলাম মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে ঈমান ও তাকওয়াকে গুরুত্ব দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে-

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।"[৩৯]

এ আয়াত মানবসমাজে মর্যাদার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক পরিচয়। ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থান একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে ভূমিকা রাখলেও ইসলামে তা মর্যাদার মানদণ্ড নয়; বরং ঈমানই প্রধান পরিচয়।

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে- পোশাক, সামাজিক সম্পর্ক, বিনোদন, অর্থনীতি ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"

"মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।"[৪০]

[৩৬] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৩।
[৩৭] সূরা আয-যারিয়াত আয়াত : ৫৬।
[৩৮] সুনান আবু দাউদ হা : ১১৩৪।
[৩৯] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১৩।
[৪০] সূরা আন-নূর আয়াত : ৩০।

এ নির্দেশ ইসলামি সামাজিক শালীনতার ভিত্তি স্থাপন করে। অন্যদিকে বাংলা সংস্কৃতির কিছু অংশে সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় এমন উপাদান যুক্ত হয়েছে যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সমাজচিন্তক কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর শাশ্বত বাংলা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলা সংস্কৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রভাবের কারণে বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল রূপ ধারণ করেছে (পৃষ্ঠা : ২১-৪৫)। ফলে এটি স্থির ও একরৈখিক নয়।

অতএব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, ঐশী ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা-যার উদ্দেশ্য মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা। অন্যদিকে বাংলা সংস্কৃতি একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল- যেখানে ভাষা, পরিবেশ, লোকজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় প্রভাবের সম্মিলন রয়েছে। তাই একজন মুসলিমের জন্য প্রয়োজন-সংস্কৃতির যে অংশ ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা গ্রহণ করা এবং যে অংশ ইসলামি আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা পরিহার করা। এ ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামের নির্দেশিত মধ্যপন্থা।

হাজার বছরের সংস্কৃতি বলার বিকৃতি : বাংলার আধুনিক বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের সূচনা ঘটে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে, যেখানে প্রশাসনিক সুবিধার কারণে নতুন পঞ্জিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়। হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষিকাজের সঙ্গে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দেয়। ফসলের মৌসুমের সাথে খাজনার মিল না থাকায় কৃষকরা প্রায়শই অসময়ে খাজনা দিতে বাধ্য হতেন। সম্রাট আকবর এ সমস্যার সমাধান করতে সৌরবর্ষ ও হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে বাংলা সনের পঞ্জিকা প্রণয়নের আদেশ দেন, যা বাস্তবায়ন করেন তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজী। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ (মতান্তরে ১১ মার্চ) থেকে এ বাংলা সনের কার্যক্রম শুরু হয়, যদিও আকবরের সিংহাসন আরোহণের দিন ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিসাব করা হয়। প্রথমে এ সনকে "ফসলি সন" বলা হতো, পরে এটি "বঙ্গাব্দ" বা "বাংলাবর্ষ" নামে পরিচিত হয়।

পহেলা বৈশাখের উদযাপনও মূলত এ প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে শুরু হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধের পরে, নতুন বছরে মানুষকে মিষ্টান্ন বিতরণ ও সামাজিক মিলনের মাধ্যমে উৎসব পালন করা হত। এসময় দোকানি ও ব্যবসায়ীরা হালখাতা খোলার মাধ্যমে হিসাব হালনাগাদ করতেন। এটি ছিল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যা প্রশাসনিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হলেও প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সমাজে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

নীহাররঞ্জন রায় তার গ্রন্থ বাঙালীর ইতিহাস (পৃষ্ঠা ৫৫-৬৫) উল্লেখ করেছেন, "বাংলা সনের আধুনিক রূপ আকবরের সময়ই শুরু হয়েছিল। পূর্বে নির্দিষ্ট পঞ্জিকা বা পহেলা বৈশাখের সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল না।" এছাড়াও রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (পৃষ্ঠা ২০-৩০) এ লিখেছেন, "পহেলা বৈশাখের নির্দিষ্ট তারিখ এবং প্রশাসনিক অনুষ্ঠান আকবরের সময়ের সৃষ্টি; পূর্বের ফসল উৎসবকে সরাসরি পহেলা বৈশাখ বলা যায় না।"

এ প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পহেলা বৈশাখের আধুনিক রূপের ইতিহাস প্রায় ৪৫০-৪৬০ বছর, এটি হাজার বছরের পুরনো নয়। যদিও প্রাচীন বাংলায় কৃষিজীবনভিত্তিক ঋতুচক্র ও ফসল উৎসব দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, আধুনিক পহেলা বৈশাখ এবং বাংলা সনের প্রশাসনিক কাঠামো ১৬ শতকে প্রতিষ্ঠিত। তাই "পহেলা বৈশাখ হাজার বছরের ঐতিহ্য" দাবি ইতিহাসভিত্তিকভাবে ভুল এবং এটি মধ্যযুগীয় প্রশাসনিক সংস্কার এবং আধুনিক সামাজিক উদযাপনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিভ্রান্তভাবে মিশিয়ে বলা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ :

পহেলা বৈশাখ এখন যে রূপে উদযাপিত হয়, সেটি আর কেবল একটি "ঐতিহ্যবাহী উৎসব" নয়। এটি সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ (cultural hegemony)। যেখানে শক্তিশালী শ্রেণি, প্রশাসনিক ও শহুরে প্রতিষ্ঠান প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিকে নতুন আকারে নিয়ন্ত্রণ করছে। পহেলা বৈশাখের আধুনিক রূপ আমাদের বলে যে, ঐতিহ্য কখনোই স্থির থাকে না, বরং শক্তির ভারসাম্যের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ফসল উৎসব বা হালখাতার মতো গ্রামীণ আচার মূলত সরাসরি কৃষিজীবন ও সামাজিক সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু আধুনিক বর্ষবরণের আচার এখন শহুরে সংগীত, মঙ্গল শোভাযাত্রা, মুখোশ, শিল্পী-সংগঠিত পারফরম্যান্স দ্বারা সংজ্ঞায়িত। অর্থাৎ, যেখানে এক সময়

উৎসব ছিল লোকের নিজস্ব সৃষ্টি, সেখানে আজ তা শহুরে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করি- যখন কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আচার শক্তিশালী শ্রেণি বা প্রশাসনের দ্বারা নতুন মানে ধারায় বাঁধা হয়, তখন প্রকৃত অর্থ ও ঐতিহ্য বিকৃত হয়। পহেলা বৈশাখের ক্ষেত্রে, শহুরে, মধ্যবিত্ত ও শিল্প-সংগঠনের আধিপত্য গ্রামের ঐতিহ্য, প্রাচীন মুসলিম নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃত সামাজিক উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করেছে। ফলে এটি একধরনের সংস্কৃতি আধিপত্য হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন নির্দেশ দেয় যে, মানুষের জীবন ও উৎসব নৈতিক ও আল্লাহভীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।[৪১]

রাসূল ﷺ বলেছেন, "কোনো উৎসব আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তৈরি করলে তা বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারে"।[৪২]

আধুনিক পহেলা বৈশাখের নগর কেন্দ্রিক, শিল্পী-নিয়ন্ত্রিত আচারগুলো মূল সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে, যা স্পষ্টভাবে সংস্কৃতির আধিপত্যের চিহ্ন। সুতরাং, মানুষ হিসেবে আমরা বুঝতে পারি-যখন সংস্কৃতির আচার শক্তিশালী শ্রেণি বা শহুরে কেন্দ্রীয় প্রভাবের হাতে চলে যায়, তখন ঐতিহ্য তার প্রকৃত অর্থ হারায়। পহেলা বৈশাখ এটাই প্রমাণ করে: এটি এখন শহুরে ও আধুনিক সংস্কৃতির আধিপত্যবাদী আকারে রূপান্তরিত, যেখানে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় নৈতিকতার সঙ্গে সংঘাত স্পষ্ট।

পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস : পহেলা বৈশাখের উদযাপন আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি জটিল ও বিবর্তিত ঘটনা। এর শুরু মূলত বাংলা সনের প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত, যা মোঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী দ্বারা সৌরবর্ষ ও হিজরি সনের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ বাংলা সন কার্যকর হয় এবং হালখাতা খোলা ও নতুন হিসাব নথি প্রবর্তনের জন্য পহেলা বৈশাখ নির্ধারিত হয়। এটি ছিল মূলত একটি কৃষিজীবনভিত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক অনুষ্ঠান, যেখানে ভূমি মালিক, ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ জনগণ একত্রিত হয়ে নতুন বছরের সূচনা উদযাপন করতেন।[৪৩]

ব্রিটিশ শাসনের সময় পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ উদযাপন ও সরকারি ছুটি হিসেবে আনুষ্ঠানিকীকরণ করা হয়, যা শহুরে প্রশাসনিক প্রভাবকে আরো দৃঢ় করে। তবে শহরের মানুষের দৈনন্দিন সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মেলানোর জন্য মূল আচারগুলো-হালখাতা, মিষ্টান্ন বিতরণ, সামাজিক মিলন-ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। ১৯৬৭ সালে ঢাকার সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান চালু করে। এটি ছিল মূলত গ্রামীণ ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতিফলন, যেখানে গ্রামীণ জীবন, লোকগীতি, নৃত্য ও মুখোশ ব্যবহৃত হতো। তবে এ শোভাযাত্রা তখনো বড় শহরের দর্শক-আকর্ষণের জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ১৯৮৯ সালে এ শোভাযাত্রা নিয়মিত এবং শহুরে দর্শক-আকর্ষণমূলক আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে দেখা যায়, শহুরে শিল্পী, নাট্যনাটিকা, মুখোশ এবং অতিরিক্ত নাটকীয় পরিবেশের আধিপত্য, যা প্রাচীন গ্রামীণ ও নৈতিক উদ্দেশ্যকে গ্রাস করেছে। এ আধিপত্যকে একজন সমাজবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক অধিপত্য হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেখানে আধুনিক শহুরে শক্তি প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্গঠন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, উৎসবের নামে এমন কোনো আচার বা সংস্কৃতি লালন করা সমীচীন নয় যা একটি জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও মৌলিক আদর্শের মূলে আঘাত করে। পহেলা বৈশাখের বর্তমান অনেক আয়োজনই বাঙালির প্রকৃত লোকজ ঐতিহ্যের ধারক নয়, বরং তা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও আকিদাগত ভ্রান্তির এক সংমিশ্রণ। বিশেষ করে মুসলিম প্রধান এ জনপদে 'মঙ্গল' বা 'কল্যাণ' কামনার জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) বাদ দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা করা স্পষ্টত ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী। সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আমাদের এমন সংস্কৃতি চর্চা করা উচিত যা শালীনতা, একত্ববাদ এবং নিজস্ব স্বকীয়তাকে সমুন্নত রাখে। বিকৃত ও আমদানিকৃত অপসংস্কৃতির মোহ ত্যাগ করে তাওহীদি চেতনা এবং সত্য ঐতিহ্যের পথে ফিরে আসাই হবে সময়ের দাবি। তবেই একটি জাতি তার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। কেননা, বাংলাদেশের মানুষের চেতনাই হচ্ছে ইসলাম।

---

[৪১] সূরা আল-হুজরাত আয়াত : ১৩।
[৪২] সহীহ বুখারী, হা : ৫৭৬১।
[৪৩] সূত্র : নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫৫-৬৫; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০-৩০।

বরকতময় মাসের পরে যেমন ছিলেন বরকতময় মানুষেরা

মো: সুলাইমান বিন হাবিবুল্লাহ ❄

রমজান বিদায় নিল.. নিভে যাওয়া প্রদীপের শেষ আলো যেমন দীর্ঘশ্বাস হয়ে কাঁপে, তেমনি এক নীরব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে হৃদয়ের আঙিনায়। যেন কোনো অতি আপনজন বরকতের চাদর মুড়ি দিয়ে চলে গেল ধীরে, শব্দহীন, অথচ গভীর অনুভবে।

এই তো সেদিন সাহারির নিস্তব্ধতায় ঘুমভাঙা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা, ইফতারের আগে শেষ মুহূর্তে দোয়ার আকুলতা, আর রাতের নির্জনতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়া... প্রতিটি ক্ষণ ছিল রহমতের স্পর্শ, প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিল মাগফিরাতের আশা।

রমজান এসেছিল আমাদের অন্তর ধুয়ে দিতে, গুনাহের ধুলা মুছে দিতে, কঠিন হৃদয়কে নরম করতে, আর আমরা অনুভব করেছি, কিভাবে ক্ষুধা আমাদের সংযম শেখায়, তৃষ্ণা আমাদের ধৈর্য্যের গভীরতা বুঝায়, আর ইবাদত আমাদের রবের কাছে নিয়ে যায় নিঃশব্দ ভালোবাসায়।

আজ সে চলে গেছে... পেছনে ফেলে গেছে তার নূরের রেখা, দোয়ার প্রতিধ্বনি, আর অশ্রুভেজা রাতগুলোর স্মৃতি। এ হারানো শুধু হারানো নয়, জীবনের সময় নামক পাতা থেকে এক সোনালী অধ্যায় ঝরে পড়া। তবে জীবনের এ পাদপীঠ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব, হাল ছেড়ে দেবো না। আমাদের সালাফগণ রমজানের বিদায়ে ব্যথিত হতেন ঠিকই, কিন্তু তারা বসে থাকতেন না বরং বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে রমজান-পরবর্তী সময়কে রমজানের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা করতেন। আমরা রমজানের পূর্বে আলোচনা করেছিলাম, 'বরকতময় মাসের পূর্বে যেমন ছিলেন বরকতময় মানুষেরা'। রমজানের মাঝে লিখেছিলাম 'বরকতময় মাসের মাঝে যেমন ছিলেন বরকতময় মানুষেরা'। এ পর্বে আমরা আলোচনা করব; "বরকতময় মাসের পরে যেমন ছিলেন বরকতময় মানুষেরা'। তাই আসুন আর কালক্ষেপণ নয় রমজান পরবর্তী সময় সালাফদের কর্মপন্থা জেনে নেই।

এক. সৎ কর্মের ওপর 'কায়েম এবং দায়েম' থাকা।

অর্থাৎ সৎকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা না করা। সালাফগণ রমজান থেকে পাওয়া এ মহান শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে ধারণ করতেন। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন :

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

অর্থাৎ 'আল্লাহর কাছে ওই আমল সর্বোত্তম যা অল্প কিন্তু নিয়মিত করা হয়'।

দুই. কোরআনের সাথে সম্পর্ক অটুট ও অবিচল রাখা। কোরআন আল্লাহর ঐশী বাণী, তাই এ মহা-গ্রন্থের সাথে যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে রাষ্ট্র সম্পর্ক গড়বে তারাই উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। আর যে জাতি, যে ব্যক্তিসত্তা এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অধঃপতনের অতল গহব্বরে হারিয়ে যাবে। তাই কোরানের সাথে সম্পর্ক গড়ার বিকল্প কিছু নেই। আমাদের সালাফগণ রমজান পরবর্তী সময়েও কোরআনের ব্যাপারে ব্যাপক পরিমাণে গুরুত্বারোপ করতেন। তাই আমরা চেষ্টা করব প্রতিনিয়ত কোরআন তেলাওয়াত করার। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোরআন সম্পর্কে বলেছিলেন :

ان الله يرفع به اقواما ويضع به آخرين

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এ (কোরআনের) মাধ্যমে কাউকে সম্মানিত করেন আবার কাউকে লাঞ্ছিত করেন'।

তিন. শাওয়াল মাসের নফল সিয়াম পালন করা। এ আমলটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবার একি সাথে অবহেলিত। রাসূল ﷺ এ সিয়ামের ফজিলত সম্পর্কে বলেন :

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر .

رواه مسلم .

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম রাখল অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম রাখল সে যেন পুরো বছরই সিয়াম রাখল'।

চার. রমজান মাসে কৃত ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আকুল হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা। আমরা সালাফদের জীবনী থেকে এমনও পেয়েছি, কোনো কোনো সালাফ ছয় মাস ধরে আল্লাহর কাছে কেবল এই বলে প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে

❄ এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মহিমান্বিত মাস রমজানে উপনীত করুন'। যখন তারা এ মাসে পদার্পণ করতেন তখন আমলের প্রতি কঠিন মনোনিবেশ করতেন এবং চেষ্টা প্রচেষ্টার সর্বোচ্চটা ব্যয় করতেন আমল নামক ফুলঝুরিটা ভারী করার জন্য। অতঃপর যখন রমজান শেষ হত তারা পরবর্তী ছয় মাস ধরে এ রমজানে করা আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করতেন।

পাঁচ. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া। আজ পৃথিবীতে বিশেষ করে মুসলিম জনজীবনে যত পাপাচার, অনাচার, দুরাচার তার নেপথ্যে একটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর তা হল সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ না করা। কেননা আল্লাহর ভাষ্য মতে সালাতই পারে মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল, অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে। তাই মুসলিম জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আর সালাফগণ কী রমজান, কী রমজানের বাইরে তারা এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে ছিলেন খুবই তৎপর। তাই আসুন আমরা পণ করি, এ সালাতের ব্যাপারে আর আমরা উদাসীন হবো না, ভাবলেশহীনও হবো না। মহান আল্লাহর বাণী : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر- অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

ছয়. 'কিয়ামুল লাইল' নিয়মিত করা। অর্থাৎ রাতের সালাতের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া। রমজান আমাদের শিখিয়েছে রাতের সালাতের কী গুরুত্ব, কী তাৎপর্য! সালাফগণ রমজান থেকে পাওয়া এ শিক্ষাকে রমজান পরবর্তী এগারোটি মাস ধারণ করার চেষ্টা করতেন। আর তাহাজ্জুদ গুজার বান্দাদের জন্যই অপেক্ষা করছে এমন এক সুখময় স্থান যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যে সুখময় জান্নাতের অনাবিল সুখ-শান্তি আত্মাসমূহকে প্রশান্ত করবে এবং চক্ষুসমূহকে শীতল করবে। আল্লাহর বাণী فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ:-'আর আত্মাসমূহ জানে না তাদের জন্য কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে যা চক্ষু শীতলকারী পৃথিবীতে যে সৎ কর্ম তারা সম্পাদন করত তারই প্রতিদানস্বরূপ'।

সাত. দান করার ক্ষেত্রে হস্তকে সম্প্রসারিত রাখা। অর্থাৎ নিয়মিত দান করার চেষ্টা করা। দান অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি আমল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা হতে গাফেল। সালাফগণ রমজান পরবর্তী সময়ও এ আমলটির ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করতেন। তাইতো রাসূল ﷺ বলেছেন والصدقة برهان -অর্থাৎ 'দান হলো দলিল স্বরূপ'।

আট. ইবাদতের মৌসুমগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা। অল্প আমলে ব্যাপক সওয়াব অর্জনের অপূর্ব একটি শিক্ষা রমজান আমাদের দিয়েছে।

সালাফগণ এ শিক্ষাকে ধারণ করতেন অর্থাৎ রমজানের ন্যায় ফজিলত রহমত ও বরকতময় সওয়াবের রসে টইটুম্বুর আমলের মৌসুমগুলোকে তারা লুফে নিতেন।

নয়. রমজান থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলোকে জীবন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। শিক্ষাগুলোর বাস্তব রূপায়ণ ঘটানো। সালাফগণ শুধু শিখতেন না তারা শেখা বস্তুটির সুবাস্তবায়ন দেখাতেন। রমজান থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

তাকওয়া অর্জন করা, ধৈর্য ধারণ করা, পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্প করা, সময় থাকতে সময়ের মূল্য বোঝা, সৎকাজ বেশি বেশি সম্পাদন করা, মৃতপ্রায় আমল মিসওয়াকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, দানের হাতকে সম্প্রসারিত করা, মানুষকে খাদ্য খাওয়ান, রাতের সালাতকে গুরুত্ব দেয়া, অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো, আত্মসংযমশীল হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চলে গেল রমজান.. ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই বরকতের দিনগুলো, ইবাদতের সুবাসে ভরা রাতগুলো। আকাশ যেন আজও নীরবে প্রশ্ন করে-তোমরা কি শুধু বিদায় দিলে, নাকি হৃদয়ে কিছু রেখে দিলে?

আসুন, আমরা শুধু রমজানকে বিদায় না জানিয়ে, তার শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরি- যেন আমাদের প্রতিটি দিন হয় সংযমের, প্রতিটি রাত হয় ইবাদতের, আর পুরো জীবনটাই হয়ে ওঠে এক দীর্ঘ রমজান। কারণ, সত্যিকারের মুমিন তারাই- যারা মাসের শেষে নয়, বরং সারাজীবন রমজানের আলোয় আলোকিত থাকে।

এ মাস আমাদের আত্মাকে ছুঁয়ে দিয়ে গেছে, শিখিয়েছে সংযমের নীরব শক্তি, তাকওয়ার গভীরতা, আর রবের সাথে সম্পর্কের অপার মাধুর্য। ক্ষুধার্ত মুহূর্তে আমরা বুঝেছি অভাবের ভাষা, অশ্রুসিক্ত দোয়ায় খুঁজেছি ক্ষমার দরজা, আর নির্জন সিজদায় পেয়েছি এক অনির্বচনীয় শান্তি। রমজান যেন আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগিয়ে দিয়ে বলেছে- 'ফিরে এসো, তোমার রবের পথে ফিরে এসো'।

শুব্বান পাতা

صفحات الشبان

বাংলা নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মোহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম ❋

মুঘল সম্রাটদের শাসনকার্য হিজরী সন অনুযায়ী পরিচালিত হতো। এতে করে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দিত। সমস্যার কারণ ছিল চান্দ্রবর্ষ প্রতিবছর ১০/১২ দিন এগিয়ে যায়। ফলে ফসল ওঠা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর সৌর বর্ষের হিসাবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[৪৪]

সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। হিজরী সাল অনুযায়ী ৯৬৩ সালের মুহাররম মাসে। সেই সময়ে বাংলায় শকাব্দ চালু ছিল। যার শুরুর মাস ছিল চৈত্র। উল্লেখ্য যে, শকাব্দ হলো এশিয়ার প্রাচীন রাজা শক কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণের মাস ছিল মুহাররম। মুহাররম মাস ও শকাব্দের বৈশাখ মাস উভয় মাস একসাথে মিলে যাওয়ায় তিনি প্রথম সন হিসাব শুরু করেন বৈশাখ মাস দিয়ে। ঠিক তখন থেকে চৈত্র মাসের পরিবর্তে বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষ।

পহেলা বৈশাখ ও সংস্কৃতির অনিয়ন্ত্রণশীলতা :

পহেলা বৈশাখ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ। যা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন।

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের এ পহেলা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল খুবই গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করে এদেশের সংস্কৃতিমনা কথিত সুশীল, বুদ্ধিজীবী ও হাজারো তরুণ-তরুণী। সম্রাট আকবর এ সংস্কৃতিকে উদ্ভাবন করেছেন মূলত একটি সামগ্রিক অর্থে সকল ধর্মের অংশগ্রহণে উৎসব পালনে যৌগিক উৎসব। যেখানে তার মতবাদ তথা রচিত 'দ্বীনে ইলাহী' সকল ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পহেলা বৈশাখ এ সংস্কৃতি উদ্ভাবনে তিনি মূলতঃ হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার সমাবেশ করেছেন। আসলেই বাস্তবিক অর্থে পহেলা বৈশাখ এটা কোন মুসলিমের সংস্কৃতি নয় বরং নিঃসন্দেহে এটা হিন্দুদের সংস্কৃতি।

বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ :

বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখে যে সকল কর্মকাণ্ড করা হয় তা অতীত ইতিহাসে বাঙালি মুসলিমেরা কখনও করেনি এবং এ ধরনের নোংরা কর্মকাণ্ড কখনও ভুল করে চিন্তাও করেনি। কেননা বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। যে উৎসবের মাধ্যমে ইসলামী আকীদা, আচার অনুষ্ঠানকে অবমাননা করা হয়। সেইসাথে এ আয়োজনে তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক অশ্লীলতা, বেহায়াপনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অথচ আমরা মুসলিম। আমাদের সামগ্রিক জীবনে যত উৎসব, আয়োজন পালন করি না কেন সকল কিছুর পিছনে আগে দেখতে হবে এটা আদৌও শরীয়ত অনুমোদিত কি-না? সেক্ষেত্রে পহেলা বৈশাখ এর বাইরে নয়।

পহেলা বৈশাখে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড :

শয়তান মানব জাতির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য চরম শত্রু। শয়তান বিশেষত মুসলিমদের সঠিক পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন শয়তানী নীলনকশা তৈরি করে। যাতে করে মুসলিম তার পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টা নষ্ট করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পহেলা বৈশাখ উদযাপন নিঃসন্দেহে শয়তানের নীলনকশার এক পাতানো ফাঁদ। এ উৎসবে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, আবাল-বণিতা বর্ষ বরণের নামে যেসব কাজ করে তা কোনোদিন ইসলাম সমর্থন করে না, করবেও না। তথাকথিত এ আবহমান কালে বাঙালি সংস্কৃতি বলে কথা!! এ পহেলা বৈশাখে তারা

❋ শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামীক একাডেমী, ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর জেলা।
[৪৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৪।

আয়োজন করে- বৈশাখী মেলা, যাত্রা, পালা গান, কবি গান, জারি গান ছাড়াও বিভিন্ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, লোক সঙ্গীত, প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানানো, বিভিন্ন মূর্তির প্রদর্শন, বিভিন্ন রকমের শাড়ী পরে অর্ধনগ্ন সৌন্দর্য প্রদর্শন, পান্তা ইলিশ খাওয়ার নামে ধনী শ্রেণীর লোকদের সাথে ঠাট্টার প্রহসন! চারু-শিল্পীদের রাক্ষস, পেঁচা সেজে শোভাযাত্রা, রমনার বটমূলে ছায়ানটের উদ্যোগে রবী ঠাকুরের গানের সাথে তরুণ-তরুণীর ঠোঁট মিলিয়ে গান উদযাপনসহ অসংখ্য নোংরা, ঘৃণিত, অশ্লীলতা, শির্ক, কুফরী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হয় এ পহেলা বৈশাখের নামে তথাকথিত অনুষ্ঠানে। যা একজন রুচিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অংশগ্রহণ করা কখনও সমীচীন নয়। একজন মুসলিম তো অংশগ্রহণ করতেই পারে না। বিবেকের তাড়নায় এবং রুচিশীলতার কারণে একজন অমুসলিম ও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করা ভীষণ আপত্তিকর ও রুচির পরিচায়ক।

মঙ্গল শোভাযাত্রা; আবহমান কালের সংস্কৃতি?

বাংলাদেশের বাঙালি তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিমনা পহেলা বৈশাখ উদযাপনে বর্তমানে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'কে অন্তর্ভুক্ত করে জোরালোভাবে উদযাপন করছে। যেন এ মঙ্গল শোভাযাত্রা ছাড়া পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা অকল্পনীয়। অথচ এ হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে পহেলা বৈশাখে উৎসবে তারা জোর করে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করে এবং তারা জোর গলায় বলে- এ মঙ্গল শোভাযাত্রা আবহমান কালের বাঙালির সংস্কৃতি! কী আশ্চর্য! তাদের এ কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা শুনে শয়তানও বোধহয় লজ্জা পায়! কারণ- আপনি কখন আবহমান শব্দ প্রয়োগ করবেন? কোনো কিছু ঐতিহ্য কিংবা সংস্কৃতি বলে গণ্য হবে তখন যদি সেই ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম লাগাতার চলতে থাকে। তখন বাংলা ভাষায় আবহমানকাল শব্দকে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। অথচ আমরা দেখি এ মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রথম শুরু হয় যশোরে ১৯৮৫ সালে। পরে ১৯৮৯ সালে ঢাকায় শুরু হয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের দ্বারা। যদিও প্রথম দিকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বলে এ উৎসব আয়োজন হয়নি বরং এর নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা। এখন আপনি বিচার করুণ! মাত্র ৩০-৪০ বছর আগ থেকে চালু হওয়া সংস্কৃতিকে কি আবহমানকালের সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্য বলা যাবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ :

ইসলামে মুসলিমদের জন্য দুইটি দিবসকে আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই দুই দিন হলো- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এর বাইরে অন্য কোনো দিবস পালন করা চাই সেটা আনন্দ, উৎসবের নামে হোক, কিংবা বর্ষবরণের নামে হোক, ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সকল ইবাদত, আচার অনুষ্ঠান হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য তাঁর নির্দেশিত পথে এবং রাসূল ﷺ-এর তরীকায়। এর বাইরে যে কোনো কাজেই হোক তা পরিত্যাজ্য। বিশেষত আচার অনুষ্ঠান উদযাপনে রাসূল ﷺ বলেছেন :

من تشبه بقوم فهو منهم

'যে কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৪৫]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত পহেলা বৈশাখের ইসলামবিরোধী কতিপয় কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

১. দিবস পালন ঃ ইসলামী শরীয়তে কেবলমাত্র দুইটি দিবসকে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এর বাইরে যে কোনো দিবস পালন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। চাই সেটা পহেলা বৈশাখ হোক কিংবা ভালোবাসা দিবস হোক আর জন্মদিবস অথবা মৃত্যুবার্ষিকী।

২. মঙ্গল শোভাযাত্রা :

ইসলামী বিশ্বাস হলো- মহান আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের নির্ধারক। কোনো শোভাযাত্রা, দিবস, বস্তু

[৪৫] আবু দাউদ হা : ৪০৩১।

কিংবা স্থান, সময়ের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং এর কোনো ক্ষমতাও নেই। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো দিবস, বস্তু ইত্যাদির কল্যাণের ক্ষমতা বা শক্তি রয়েছে নিঃসন্দেহে সে শির্ক ও কুফরী করল। তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে গেল। যদিও আধুনিক ইসলামবিদ্বেষী, প্রকৃতিবাদী ও সুশীল সমাজ বলে- এ শোভাযাত্রা সকল অমঙ্গলকে দূরীভীত করে কল্যাণ নিয়ে আসে!

এখানে খুব ভালো করেই মনে রাখতে হবে- মহান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো শক্তি নেই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার, এমনকি প্রকৃতিরও নেই।

৩. দিবসের নামে বেহায়াপনা :

অনৈসলামিক যত দিবস উদযাপন করা হয় সেই সকল দিবসে কমবেশি বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, বিদ' আত, কুফরী ইত্যাদি চর্চা হয়ে থাকে। তবে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে শির্ক, বিদ'আত, কুফরী এগুলো যেমন চর্চা হয় তার সাথে সমানতালে অশ্লীলতা, বেহায়াপনারও চর্চা হয়ে থাকে।

৪. নোংরা পোশাক প্রদর্শন :

পহেলা বৈশাখ যেহেতু বাঙালি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাই বিভিন্ন শিল্প কারখানা বৈশাখের আমেজে ঢাক, ঢোল, তবলা, গিটার, বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গভঙ্গির ছবি, অংকন দিয়ে তৈরি করে বিভিন্ন রকমের পোশাক। সেই সাথে আঁটোসাঁটো পোশাক ও পাতলা আবরণের পোশাকেরও হয় সস্তা সৌন্দর্য প্রদর্শন। যেটা ইসলামী শরীয়তে হারাম।

৫. বিভিন্ন ট্যাটু,ছবি প্রদর্শন :

পহেলা বৈশাখের এ উদযাপনে মহান আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের অবয়বকে বিভিন্ন জীব জন্তুর ছবি, প্রতিকৃতির দ্বারা অবমাননা করা হয়। শিক্ষিত নামের মূর্খরা বানর, পেঁচার প্রতিকৃতির সাজসজ্জা করে নিজেদের জীব-জন্তুতে পরিণত করছে! ফলত এ উদযাপনকে আনন্দঘন করতে তারা বিভিন্ন প্রতিকৃতি, মূর্তির ছবি তৈরি করে। যেটা ইসলামে হারাম। রাসূল ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক ঘৃণিত বা আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলো ছবি অথবা প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারী।[৪৬]

সুধী পাঠক! ইসলাম সামগ্রিকভাবে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সকল ক্ষেত্রে ইসলাম আমাদের জন্য যে নীতিমালা, দিকনির্দেশনা প্রদান করে সে অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারলে আমাদের উভয় জীবন সফল হবে ইন শা-আল্লাহ। শয়তান যতই তার শয়তানী নীলনকশা তৈরি করে আমাদের সামনে পেশ করুক না কেন, আমাদের কোনোমতেই তার পাতানো ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। চাই সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হোক। তাই আসুন আমরা ঈমান বিধ্বংসী এ প্রচলিত পহেলা বৈশাখ উদযাপনকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নিজ পরিবার থেকে শুরু সমাজ ব্যবস্থায় সচেতনতা তৈরি করি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমান বিনষ্টকারী সকল কর্মকাণ্ড থেকে হেফাজত করুক, আমীন।

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩ , উত্তর যাত্রাবাড়ী , ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/
http://www.jamiyat.org.bd

[৪৬] সহীহ বুখারী হা : ৫৫১৮।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর

মো. খশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আলী*

এখন ঘর থেকে বের হওয়া মানেই যেন অনিশ্চয়তার দিকে এক নীরব যাত্রা। কে জানে, এই বের হওয়াই শেষ বের হওয়া কি না! ফিরে আসতে পারবো কি না, এই প্রশ্নটা যেন অদৃশ্যভাবে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে লেগে থাকে। একটি ফোনকল, একটি ছোট্ট খবর, আর তাতেই ভেঙে পড়ে একটি পরিবার, নিভে যায় একটি ঘরের আলো। যে মানুষটি সকালবেলা হাসিমুখে বের হয়েছিল, সন্ধ্যায় তারই নিথর দেহ ফিরে আসে, কখনো কফিনে, কখনো অ্যাম্বুলেন্সে, আবার কখনো আর ফিরেই আসে না।

কত পরিবার আছে, যেখানে সেই মানুষটিই ছিল একমাত্র উপার্জনকারী, তার কাঁধেই ছিল পুরো সংসারের ভার। তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু একজন মানুষ হারায় না, হারিয়ে যায় একটি পরিবারের স্বপ্ন, ভেঙে পড়ে ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনা। ছোট ছোট সন্তানেরা হারায় তাদের আশ্রয়, বৃদ্ধ মা-বাবা হারায় তাদের ভরসা। এক মুহূর্তেই সবকিছু থেমে যায়, হাসি থেমে যায়, চুলা নিভে যায়, জীবন হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ ও অন্ধকারময়।

গত সাত দিনের (১৮/০৩/২৬ থেকে ২৫/০৩/২৬) পত্রিকার পাতাগুলো যেন শোকের কালো অক্ষরে ভরে উঠেছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে অন্তত ২০৭ জন মানুষের। কিন্তু আমরা সবাই জানি, সংখ্যাটা এখানেই থেমে নেই। পত্রিকার পাতায় যে সংখ্যা উঠে আসে, তার বাইরেও রয়েছে অসংখ্য নামহীন মৃত্যু, অগণিত অজানা গল্প, যাদের কান্না কেউ শোনে না, যাদের ব্যথা কেউ লিখে না।

আরো এমন অনেক দুর্ঘটনা আছে যে দুর্ঘটনাতে নিখোঁজ রয়েছে অনেক প্রাণ, কোথায় তারা, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না- কেউ জানে না। তাদের পরিবারের প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে দুঃসহ অপেক্ষায়, অনিশ্চয়তার দহন নিয়ে। প্রতিটি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে বুক কেঁপে ওঠে, এই বুঝি কোনো খবর এলো! কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সেই অপেক্ষা রয়ে যায় শূন্যতায়।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেও কখনো কখনো এত মানুষের মৃত্যু একসঙ্গে ঘটে না। অথচ আমাদের দেশে কোনো যুদ্ধ নেই-তবুও প্রতিদিন আমরা হারাচ্ছি আমাদের আপনজনদের। সড়ক দুর্ঘটনা যেন আমাদের নীরব যুদ্ধ, যেখানে নেই কোনো সাইরেন, নেই কোনো যুদ্ধঘোষণা, কিন্তু প্রতিদিন লাশের মিছিল বাড়ছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ হেরে যাচ্ছে এ অদৃশ্য যুদ্ধে।

এরই মাঝে আরো বেদনাদায়ক এক বাস্তবতা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। গত ২৫ মার্চের বাস দুর্ঘটনা বিষয়ে বলা হচ্ছে, নিহতদের পরিবার পাবে ২৫ হাজার টাকা! আর আহতদের পরিবার পাবে ১৫ হাজার টাকা। এ ঘোষণাটি শুনে বুকের ভেতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

একজন মানুষের জীবন, একটি পরিবারের স্বপ্ন, একটি সন্তানের ভবিষ্যৎ, সবকিছুর মূল্য কি তাহলে মাত্র ২৫ হাজার টাকা?!!

একজন আহত মানুষের যন্ত্রণা, তার সারাজীবনের কষ্ট, সেটার মূল্য কি মাত্র ১৫ হাজার টাকা?

যে মানুষটি প্রতিদিন আয় করে পরিবার চালাত তার অনুপস্থিতিতে এ সামান্য অর্থ কতদিনই বা চলবে?

যে মানুষটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেল, তার চিকিৎসা আর জীবনের সংগ্রাম কি এই ক'টাকায় মিটবে?

একটি শিশুর বাবাহারা হওয়া, বা এক মায়ের একমাত্র সন্তান হারানো, এসব বেদনার কি কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায়?

* মুতাদার্রিব, মাদরাসা দারুত তাওহীদ, ঢাকা।

এখন প্রশ্ন জাগে,

তাহলে কি মানুষের জীবন এতটাই সস্তা হয়ে গেছে?

মানুষের জীবন কি তবে এভাবে টাকার অঙ্কে কেনাবেচা করা যায়?

এ যেন শুধু কিছু অর্থের ঘোষণা নয়, এ যেন আমাদের অসহায়তার এক নীরব স্বীকারোক্তি, যেখানে একটি জীবনের প্রকৃত মূল্য কোনো সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রতিদিন এত শোক, এত কান্না, এত লাশ, সবকিছু দেখতে দেখতে আমাদের হৃদয় যেন ধীরে ধীরে অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে। আগে যেখানে একটি মৃত্যু আমাদের কাঁদাতো, এখন শত মৃত্যুর খবরও আমাদের ভেতরকে তেমন নাড়িয়ে দিতে পারে না। আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি লাশের সংখ্যা গুনতে, দুর্ঘটনার খবর জানতে, শোকের গল্প পড়তে।

সত্যিই,

আমরা যেন সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছি,

'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'

এ এক ভয়াবহ সময়,

যেখানে মানুষ বেঁচে আছে, কিন্তু নিরাপদ নয়;

চলাফেরা করছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়;

হাসছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয় নিয়ে বেঁচে আছে।

এ এক নির্মম বাস্তবতা,

যেখানে আমরা জীবনের পথে চলছি,

কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া আমাদের পিছু তাড়া করছে।

এ ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু শোক প্রকাশ করে থেমে থাকতে পারি না। প্রতিদিন এত প্রাণ ঝরে পড়ছে, এত পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, এগুলো আর শুধুই দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি চলমান জাতীয় সংকট। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কিছু জরুরি প্রত্যাশা ও দাবি :

১) কঠোর সড়ক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন : বেপরোয়া চালনা, লাইসেন্সবিহীন চালক ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) চালকদের প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা :

পেশাদার চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত তদারকি চালু করা।

৩) মানবিক ও বাস্তবসম্মত ক্ষতিপূরণ :

হতাহতদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ও সম্মানজনক সহায়তা নিশ্চিত করা।

৪) নিরাপদ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন :

রাস্তা, সাইনাল ব্যবস্থা, ফুটওভারব্রিজ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

৫) দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা :

দুর্ঘটনার পরপরই জরুরি সেবা ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

সংক্ষেপে বলতে চাই, আমাদের দাবি একটাই, মানুষের জীবনের মূল্য যেন কাগজের অঙ্কে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদে ঘরে ফেরার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা হোক।

সবশেষে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করি,

হে আল্লাহ! আমাদের দেশ ও সড়কগুলোকে নিরাপদ করুন, সকল দুর্ঘটনা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের ক্ষমা করুন, আহতদের পূর্ণ শিফা দিন। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফিক দিন, যেন মানুষ নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে। আমীন।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) *কোনো মহিলা কি তার বোনের স্বামী (সাথে বোনও সরফসঙ্গী) বা তার ছেলের শশুরকে মাহরাম হিসাবে জেনে হজ্ব যেতে পারবে?*

শাকিল হোসাইল, কৌতুয়ালী, দিনাজপুর।

উত্তর : বোনের স্বামী বা ছেলের শশুর ইসলামি শরিয়তে মাহরাম নন।[১] তাদের সাথে হজ্ব সফরে যাওয় যাবে না। কেননা মহিলাদের উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা। যে মহিলা হজ্ব সফরের জন্য কোন মাহরাম পাবে না, তার উপর হজ্ব ফরয হবে না।[২]

প্রশ্ন (২) : *বাংলাদেশের হাজীদের মীকাত কোনটি? তারা কি বিমানে জেদ্দা অবতরণ করে সেখান থেকে ইহরাম বাধবে না তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে সেখান থেকে ইহরাম বাধা ওয়াজিব?*

মেহেরাজ, চিরিবন্দর, দিনাজপুর

উত্তর : বাংলাদেশের হাজীরা পানি জাহাজে গমন করলে তাদের মীকাত হবে ইয়ালামলাম পাহাড়, যা ইয়ামেনে অবস্থিত। আর উড়োজাহাজে সফর করলে তাদের মিকাত হবে কারনুল মানাযিল- যা সাইল কাবীর নামে প্রসিদ্ধ (বর্তমান তায়েফ বরাবর)। এই স্থান বরাবর হলেই হাজী সাহেবদের হাজ্জে প্রবেশের নিয়ত করতে হবে। অর্থাৎ- এটাই তাদের মিকাত। ইহরাম ছাড়া এটা অতিক্রম করা জায়িয নয়। কেউ বিনা ইহরামে মিকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধতে হবে। নতুবা ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার জন্য একটি দম তথা কুরবানী আবশ্যক। জিদ্দাকে মিকাত মনে করার কোন দলীল নেই। কাজেই ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর 'আমল করা আদৌ ঠিক না।[৩]

প্রশ্ন (৩) : *আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি –ইন্‌শা-আল্লাহ। আমি জেনেছি মীকাত থেকে ইহরাম অর্থাৎ- হাজ্জের নিয়্যাত করে হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতায় প্রবেশ করতে হয়। এক্ষণে ভুলবশতঃ যদি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে ফেলি, তাহলে আমার হাজ্জ হবে কী? জানালে উপকৃত হব।*

হাবিবুর রহমান, কুমিল্লা।

উত্তর: মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে হাজ্জ প্রবেশ করা ওয়াজিব। এ মীকাত রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধরিত স্থান।[৪] যদি কেউ 'উমরাহ্ বা হাজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তাকে পুনরায় মীকাতে ফিরে এসে ইহরামসহ প্রবেশ করতে হবে। আর যদি কোন অবস্থাতে মীকাতে ফিরে আসা সম্ভম না হয়, তাহলে মক্কার গরীবদের মধ্যে একটি ছাগল/দুম্বা যবেহ করে বন্টন করে দেবে।[৫] এভাবে দম দেয়ার মাধ্যমে হাজ্জ সহীহ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৪) : *মহান আল্লাহ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ "হাজ্জের মাসসমূহ জ্ঞাত।" আমার প্রশ্ন : হাজ্জের মাস কোন্‌টি? আর মাসসমূহ জ্ঞাত বলতে মহান আল্লাহ কী উদ্দেশ্য করেছে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।*

ফাইম মিয়া, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : হাজ্জের মাস বলতে– শাওয়াল, যুলকা'দাহ ও যুলহাজ্জ-এর প্রথমার্ধকে বুঝায়।[৬] আর হাজ্জের মাসসমূহ জ্ঞাত বলতে-উপরোক্ত মাস ছাড়া হাজ্জ ফর্‌য হয় না-একথা বুঝানো হয়েছে।[৭]

---

[১] সূরা আন-নিসা আয়াত : ২৩।
[২] সহীহ বুখারী হা : ১৭২৯ ও সহীহ মুসলিম হা : ২৩৯১।
[৩] সুনান আবূ দাউদ- হা : ১৭৩৯, সুনান আন্‌-নাসায়ী- হা : ২৩৫৬, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা : ১১৮১।
[৪] সহীহুল বুখারী- হা: ১৫২৪; সহীহ মুসলিম- হা: ১১৮১।
[৫] মু'আত্তা- ১/৪১৯ ও আদ-দারুকুতনী- ২/২৪৪, সনদ সহীহ।
[৬] ইমাম ইবনু জারীর তাফসীরে আত-তাবারী- ৩৫১৮ পৃ:; ফতহুল বারী- ৩/৪২০।
[৭] আদ-দারকুতনী- ২/২৩৪।

প্রশ্ন (৫) : *আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি। আমার একটি সমস্যা আছে, যা বছরে হঠাৎ কখনও দেখা দেয়। আবার এমনও হয় যে, পরপর ২/৩ বছর এমন কোন সমস্যা দেখা দেয় না। যখন ঐ অসুখ দেখা দেয়, তখন আমি কোনভাবে নড়াচড়া করতে পারি না। উপরন্তু আমার জীবন সংকটাপন্ন বলে মনে হয়। যদি আমার এ হাজ্জ সফরে ঐ রোগ দেখা দেয়, তাহলে আমি কি করব? দয়া করে জানিয়ে খুশী করবেন। সামিউল ইসলাম*

উত্তর : যদি আপনার এই রকম আশংকা থাকে যে, হাজ্জ সফরে কোথাও বাঁধা প্রাপ্ত হতে পারেন বা হাজ্জ করার সামর্থ হারিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য শর্তের রূপ হলো যদি আমি কোন স্থানে প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হই, তাহলে ঐ স্থানেই হবে আমার ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার স্থান। আপনি আরবীতে বলতে পারেন এভাবে–

اللهم لَبَّيْكَ حَجًّا، فإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسَنِيْ.

বাক্যসমষ্টি উচ্চারণ করে কিংবা মনে মনে স্থির করে হাজ্জে প্রবেশ করবেন। যদি কোন স্থানে ঐ সমস্যা দেখা দেয় এবং আপনি অপারগ হয়ে পড়েন, তাহলে ঐ স্থানেই আপনি মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম ছেড়ে দেবেন। আপনার উপর কোন ক্বাযা করতে হবে না।[৮] -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত বেশি না-কি রমাযানের শেষ দশকের, বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

এ দশ দিনের চেয়ে এমন কোনো দিন নেই যার সৎ আমল মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়...।"[৯]

প্রশ্ন (৬) : *আমাদের বাড়ির পাশে ত্রিশ বছর পূর্বের একটি কবর আছে এবং কবরের পাশ দিয়ে লোকজন চলাচল করে এমনকি কবরটির বেড়া না থাকার কারণে অনেক সময় লোকজন কবরের উপর দিয়েও চলে যায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই কবরকে কি অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করা যাবে কি? মেহেরবানী করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক উত্তরদানে উপকৃত করবেন।*

আজমল হোসাইন, চাঁদপুর

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কবর স্থানান্তর করা বৈধ নয়। সমাজ কিংবা বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম যদি মনে করেন যে, কবরটি সরানো একান্ত প্রয়োজন তাহলে অত্যন্ত স্ব-সম্মানে তা করা যাবে।

নাবী ﷺ জাবের ইবনু 'আবদুল্লাহর পিতা যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁর লাশ উঠিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করেন।[১০] সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন হলে কবর স্থানান্তর করা বৈধ।

প্রশ্ন (৭) : *আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাবে যিকর প্রচলিত সুতরাং কোন পদ্ধতিটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত? যিকির কি মনে মনেই করতে হবে নাকি উচ্চস্বরেও করা যায়?*

উত্তর : যিকর মানে হচ্ছে স্মরণ করা। আল্লাহকে যে কোনো সময় যে কোনোভাবে স্মরণ করাই হচ্ছে আল্লাহর যিকর। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের একটি দু'আ রয়েছে যেমন খাওয়া শুরু করার আগে দু'আ, ঘুমাবার সময় দু'আ ইত্যাদি প্রতিটি দু'আই আল্লাহর যিকর। যিকর নীচু আওয়াজে করতে হয়। যিকরের সময় লাফালাফি করা, চিৎকার করা, শরীর এবং মাথা অস্বাভাবিক ভাবে ঝুলানো ইত্যাদি ইসলামে একেবারে না জায়েয ও মারাত্মক গুনাহের কাজ এবং কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী 'আমল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যিকর করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, " আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না"[১১] সকল সময় আল্লাহর স্মরণ তাসবীহ, বিভিন্ন দু'আ দরূদ মনে মনে পড়ার মাধ্যমে যিকর করতে

[৮] সহীহ বুখারী- হা : ৫০৮৯ ও সহীহ মুসলিম- হা: ১২০৭।
[৯] সুনান আবূ দাউদ- হা : ২৪৪০, মা. শা, হা. ২৪৩৮, সহীহ
[১০] সহীহ বুখারী।
[১১] সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ২০৫।

হবে। যিকরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিক-নির্দেশনার আলোকে সাজানো। অতএব শুধু সুনির্দিষ্ট কিছু যিকর পড়লে হবে না। যিকরের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে সে অনুযায়ী ‘আমল করতে হবে।

☞ প্রশ্ন (৮) : ***বর্তমানে আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম লটারি করতে দেখা যায়। আর বলা হয়ে থাকে লটারির দ্রব্য কিনলে আর্তমানবতার সেবা করা হবে এবং উক্ত টাকা বিভিন্ন হাসপাতাল বানানোর কাজে লাগানো হবে। এ ধরনের লটারি বাজারে ছাড়া বা ক্রয় করা কি ইসলাম সম্মত?***

(আ: ওয়াহেদ, নারায়ণগঞ্জ)

উত্তর : এ জাতীয় লটারি একধরনের জুয়া। সুতরাং যেটি জুয়া হিসেবে বিবেচিত সেটি ইসলামে বৈধ নয়। মহান আল্লাহ জুয়া হারাম করে ঘোষণা দিয়েছেন, “ হে মুমিনগণ , নিশ্চয় মদ, জুয়া , প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও”[১২]

☞ প্রশ্ন (৯) : ***জনৈক ব্যাক্তি কাবাঘরের ছবি দেখিয়ে বলছিলেন যে, উক্ত ছবি দোকানে বা বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখলে ব্যবসার উন্নতি হবে, সকল বালামুসিবত কেটে যাবে। কথাটি কি সত্য?***

উত্তর : কথাটি মোটেও সত্য নয়। ইসলামে কাবা ঘরের ছবির ব্যাপারে এমন কিছুই বলা হয়নি । এক শ্রেণির লোক তাদের অজ্ঞতার এ ধরনের কথা বলে থাকে, ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। কেউ এ ধরনের বিশ্বাস রেখে তা করলে তা হবে গুনাহের কারণ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে এমন কাজ করল যা আমাদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত”[১৩]

[১২] সূরা মায়িদা আয়াত : ৯০ ।
[১৩] সহীহ মুসলিম হা : ৩২৪৩।

☞ প্রশ্ন (১০) : ***আমাদের সমাজে এক শ্রেণির লোকদের দেখি যে তারা অযুর সময় গর্দান বা ঘাড় মাসাহ করেন কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের তা করতে দেখি না । আমি জানতে চাই যে আসলে কোনটি সঠিক? কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে জানতে চাই। (ইসহাক আলী, মেহেরপুর)***

উত্তর : অযুতে গর্দান তথা ঘাড় মাসাহ করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এ সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো যঈফ কিংবা জাল এবং তা সহীহ হাদীস বিরোধী। সাধারণত ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে সুনান আবূদাউদে বর্ণিত হাদীসটি পেশ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ মাথা মাসাহ করলেন এবং দুই কানের মধ্যবর্তী মাথার পিছন পর্যন্ত মাসাহ করলেন। প্রথমত হাদীসটি দূর্বল। শাইখ আলবানী রহ এটিকে যঈফ আবূ দাউদে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত গর্দান বা ঘাড় আরো নিচে অবস্থিত। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা ঘাড় মাসাহ করা প্রমাণিত হতে পারে না। ইমাম গাযালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, “ঘাড় মাসাহ করা কেয়ামতের দিন শিকল বন্দি হওয়া থেকে মুক্তির গ্যারান্টি” হাদীসটি জাল হাদীস। এটি নাবী ﷺ-এর কোনো বানী নয়। আল্লামা শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ এ ‘আমলটিকে বিদ‘আত আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন “ ঘাড় মাসাহ সংক্রান্ত নাবী ﷺ হতে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস নেই”[১৪]।[১৫] শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন “ ঘাড় মাসাহ করা এটি মুস্তাহাবও নয় এবং কোনো বিধানও নয়। মাসাহ হবে কেবল মাত্র মাথা এবং উভয় কানের”[১৬] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন “ নাবী ﷺ হতে একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি যে তিনি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করেছেন”। বরং অযুর সহীহ হাদীসগুলোতে ঘাড় মাসাহ এর কোন আলোচনাই আসেনি। সুতরাং অধিকাংশ ওলামা যেমন- ইমাম মালিক শাফেঈ , আহমাদ প্রমুখের নিকট এ ‘আমলটি মুস্তাহাবও নয়।[১৭] সুতরাং ওযূর মদ্ধ্যে গর্দান তথা ঘাড় মাসাহ বর্জনীয়। আল্লাহু আ‘লাম।

[১৪] যাদুল মা‘আদ : ১৯৫ ।
[১৫] যাদুল মা‘আদ- ১৯৫/১ ।
[১৬] মাজুম ফাতাওয়া বিন বাজ : ১০২ ।
[১৭] মাজমুউল ফাতাওয়া ১২৭ ।

প্রশ্ন (১১) : সূদ মহাপাপ বা কাবীরা গুনাহ তা আমরা জানি কিন্তু তার সত্তরের অধিক স্তর রয়েছে যার সর্বনিম্ন স্তর আপন মায়ের সাথে বিবাহ করা বা ব্যভিচার করার সমপর্যায়ের কথা বলা হয় এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীসও পেশ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি কি আসলেই সঠিক? দয়া করে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন।

রাইসুল ইসলাম

উত্তর : নিঃসন্দেহে সূদ একটি হারাম এবং চরম ঘৃণিত কাজ। যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

সূদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি পেশ করা হয়ে থাকে।

الرِّبَا سَبْعُونَ جزأ أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

অর্থাৎ- সূদের সত্তরটি স্তর রয়েছে। সবচেয়ে নিম্নটি হল- নিজের মাকে বিবাহ করা।[১৮]

তাছাড়া মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, এক দেরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়া সত্তর বার যিনা করার চেয়েও মারাত্মক।

এ সমস্ত হাদীসগুলো বক্তাদের মুখে মুখে এমনকি বিজ্ঞ 'আলেমদেরও যারা সর্বদা সহীহ হাদীসের কথা বলেন তাদের মুখে মুখেও ব্যপকভাবে প্রচলিত আছে। এ হাদীসগুলিকে কেউ হাসান বা সহীহ বলেছেন আবার কেউ মুনকার তথা সহীহ হাদীস বিরোধী ও বর্জনযোগ্য বলেছেন। কেননা এ সংক্রান্ত হাদীসগুলির প্রতিটি বর্ণনায় কোন না কোন যঈফ মাতরুক অথবা যাল হাদীস রচনাকারী রয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের প্রথিতযশা শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ অনুরুপ মন্তব্য করেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল মাওযুয়াত (২৪৭-২) এ বলেন : এ সংক্রান্ত হাদীসগুলিতে সহীহ বলতে কিছুই নেই। শাইখ আব্দুর রহমান আল মুয়াল্লিমি ইয়ামানি বলেনঃ এ হাদীসগুলি নবী ﷺ হতে বিশুদ্ধ নয়।[১৯]

আল্লামা আবু ইসহাক আল কুওইনী বলেনঃ এ হাদীসগুলির নিসবত বা সম্বোধন নবী ﷺ-এর দিকে করা কোন ক্রমেই জায়েয নাই। তবে শাইখ নাসিরউদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২০]

প্রশ্ন (১২) : হজ্জে বা ওমরায় গিয়ে কোন ইবাদত বেশী করা জরুরী কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, তাওয়াফ, সাঈ, অথবা ওমরা পালন?

(আশিক হাওলাদার, রাজশাহী)

উত্তর : হজ্জের সময় সুযোগ পেলে বেশী বেশী তাওয়াফ করবেন। তবে মক্কা শরীফে গিয়েই ওমরা করার পরে আর পরবর্তীকালে ওমরা করার কোন প্রয়োজন নেই । পরবর্তীতে যে ওমরা লোকেরা মসজিদে আয়েশা হতে করে থাকেন সেই ওমরা মুলত পালন হয় না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে)" নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াতও করা যেতে পারে। মূলত হজ্জের সময় হজ্জের ফরয, ওয়াজিবগুলোর দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৩) : আমি নি:সন্তান বিধবা মহিলা, আমার স্বামীর আগের স্ত্রীর দুজন ছেলে মেয়ে আছে। এমতাবস্থায় আমার প্রাপ্য হক কী? আমি নি:সন্তান হওয়ায় কি আমি সম্পদ পাবোনা?

খাইরুল ইসলাম তালুকদার, রাজশাহী

উত্তর : আপনার মৃত স্বামীর দুজন ছেলে মেয়ে থাকায় স্বামীর সম্পদে আপনার প্রাপ্য হার হলো ১/৮ এক অস্টমাংশ। সম্পদের বন্টন নিম্নরূপ হবে:

উল্লেখ্য সে, আপনি নি:সন্তান হওয়ায় স্বামীর সম্পদে ১/৪ এক চতুর্থাংশ পাবেন এই ধারনা ভুল : বরং এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে আপনার স্বামী সন্তান রেখে গেলে কি না?[২১]

আপনার মৃত স্বামীর কোন সন্তান না থাকলে একমাত্র স্ত্রী হিসেবে আপনি আপনার স্বামীর সম্পদের ১/৪ এক চতুর্থাংশ পেতেন। যেহেতু আপনার স্বামী

[১৮] ইবনু মাজাহ্- হা : ২২৭৪।
[১৯] আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়া ১৫০ পৃষ্ঠা।
[২০] আল জামে' আস্-সহীহ- হা : ৩৫৪১।
[২১] সূরা আন'আম- আয়াত : ১৪১।

সন্তান রেখে গেছেন সেহেতু আপনার প্রাপ্য ১/৮ এক অস্টমাংশ (২আনা)। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য (স্ত্রীদের) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ খনন আদায় ও অসিয়্যাত পূরনের পর।[২]

প্রশ্ন (১৪) : আমরা যে সকল জায়নামাযে সলাত আদায় করি সেগুলোতে বিভিন্ন কিছুর নকশা থাকে। এমন নকশাদার জায়নামাযে সলাত আদায়ে কোনরূপ দোষ আছে কি?

(আব্দুল আযীয, গাইবান্ধা)

উত্তর : প্রাণীর ছবি ব্যতীত এবং শির্ক ও কুফরীর নিদর্শনধারী নকশা ব্যতীত অন্যান্য নকশাদার জায়নামাযে সলাত আদায় বৈধ রয়েছে। তবে মুসল্লী ব্যক্তির উচিত হবে বিচিত্র নকশাদার জায়নামাযকে বর্জন করা, কারণ তা সলাত আদায়কারী ব্যক্তির মনোযোগ বিনষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি গুরুত্ববহ :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন একটি নকশাদার চাদরে সলাত আদায় করেন। তিনি সেই নকশার দিকে একবার দৃষ্টিদেন। যখন তিনি সলাত শেষ করলেন তখন বললেন তোমরা আমার এই চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং নকশাবিহীন কাপড়টি নিয়ে এসো। কারণ এটা এখনি আমাকে আমার সলাত থেকে অন্যমনস্ক করেছিলো।[২২]

[২২] সহীহুল বুখারী- হা : ৩৭৩, মুসলিম- হা : ১২৬৭।

প্রশ্ন (১৫) : দাবা খেলাকে অনেকে বুদ্ধির খেলা মনে করে। অনেক ধার্মিক লোককেও দাবা খেলায় আগ্রহী দেখা যায়। দাবা খেলার শারীয়াতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

(আব্দুর রহীম, মাদারীপুর)

উত্তর : ইসলামী শারীয়াতে দাবা খেলা হারাম। দাবা খেলা হারাম হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই-

খেলা ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণ থেকে পুরোপুরি অমনযোগী করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, ইত্যাদী হারাম ঘোষণা করার বড় কারণ বলেছেন এসব ব্যক্তিকে আল্লাহর যিকর থেকে ভুলিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন,

"শয়তানতো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সলাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে, অবএব তোমরা এখনও কি বিরত হবে না।?[২৩]

দ্বিতীয়ত দাবার গুটি গুলো মূর্তি আকৃতি দিয়ে তৈরি আর এ সকল মূর্তি প্রতিকৃতি হারাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[২৪]

সুতরাং দাবা খেলা হারাম বা নিষিদ্ধ।[২৫]

প্রশ্ন (১৬) : যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের জন্য কি সালাতে বাংলায় দুআ করা জায়েয?

উত্তর : সালাতের ভিতরে আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় দুআ করা যাবে কি না, এব্যাপরে আলেমদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দুআ করা জায়েয নেই। আরেক

[২৩] সূরা মায়িদা- আয়াত : ৯১।
[২৪] সহীহ বুখারী হা : ৩২২৬, মুসলিম হা : ২১০৬।
[২৫] ফতওয়া উলামায়ি বালাদিল হারাম পৃ: ১৫৭৫।

শ্রেণীর আলেমের মতে যাদের ভাষা আরবী নয় কিংবা যারা ভালোভাবে আরবী বলতে ও পড়তে পারে না, তাদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় দুআ করা জায়েয আছে।

এক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে যারা আরবী বুঝে তাদের জন্য আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দুআ করা উচিৎ নয়। কিন্তু যারা আরবী বুঝতে বা পড়তে অক্ষম তাদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় সালাতের মধ্যে দুআ করা বৈধ। এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত।[২৬]

প্রশ্ন (১৭) : কুরআনুল কারীমে যেসব আয়াত দুআ আকারে এসেছে, সেগুলো কি সিজদাতে পাঠ করা যাবে?

উত্তর : আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুমিনদের জন্য সালাতের মধ্যে দুআ করার স্থানগুলোতে কুরআনের দুআ পাঠ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তিলাওয়াতের নিয়তে পড়বে না, দুআর নিয়তে পাঠ করবে। কেননা সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা শরীয়ত সম্মত নয়। কুরআনের দুআ যেমন-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নয়নশীতলকারী বানাও"।[২৭]

অনুরূপ সূরা বাকায় এসেছে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করো এবং পরকালে কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো"।[২৮]

সূরা আল-ইমরানের ৮নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا "হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিওনা"। এধরণের অন্যান্য দুআ সিজদায় পাঠ করা জায়েয আছে। অতএব দুআর নিয়তে কুরআনের দুআগুলো সিজদায় পাঠ করা যাবে। কেননা রাসূল ﷺ সালাতের রুকু-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করকে নিষেধ করেছেন। সালাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত করা শরীয়ত সম্মত।[২৯]

প্রশ্ন (১৮) : কুরবানীর বিধান (হুকুম) কী?

উত্তর : কিছু আলিম স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব মনে করলেও অধিকাংশ আলিমগণ তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করেন।

দলীল-১ : উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয় আর তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী দেয়ার ইচ্ছা করে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)।[৩০]

অত্র হাদীসে নাবী ﷺ কুরবানী করা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর ওয়াজিব কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়।

দলীল- ২ : সাহাবীগণ কুরবানী করা ওয়াজিব মনে করতেন না।

আবূ মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও আমি কুরবানী করা এজন্য পরিত্যাগ করি যাতে আমার প্রতিবেশীরা মনে না করেন যে, তা আমার জন্য আবশ্যক।[৩১]

আবূ সারীহা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণিত তিনি বলেন : আমি আবূ বকর ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি তারা কুরবানী করতেন না।[৩২]

পক্ষান্তরে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না সে যেন ঈদগাহে না আসে" ইমামদের মতে এটি সাহাবীর বক্তব্য।

অনুরূপ মিখনাফ ইবনু সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস "প্রত্যেক বাড়ীওয়ালার ওপর প্রতি বৎসর কুরবানী আবশ্যক" হাদীসটি যঈফ। কারণ এর একজন রাবী আবূ রামলাহ যার নাম আমির তিনি মাজহূল।[৩৩]

---

[২৬] সহীহ মুসলিম হা : ৪৮২।
[২৭-২৯] সূরা ফুরকান আয়াত : ৭৪।
[২৮] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২০১।
[২৯] সহীহ মুসলিম হা : ৪৮০।
[৩০] সহীহ মুসলিম হা : ১৯৭৭, ইবনু মাজাহ হা : ৩১৪৯ ।
[৩১] সহীহ মুসনাদ আ: রাজ্জক হা: ৮১৪৯, বায়হাকী হা : ৯/২৬৫।
[৩২] সনদ সহীহ, মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক হা: ৮১৩৯, বাইহাকী হা: ৯/২৬৯
[৩৩] তাকরীর ১/৩৯০।

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	”	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	”	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	”	৩২/-
৫	তারাবীহ	”	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	”	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	”	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	”	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	”	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	”	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	”	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	”	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	”	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

“বিকাশ নম্বর”
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

“সাপ্তাহিক আরাফাত”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সূচিপত্র

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা বহু গুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

সূরা আল হাদীদ- ১১

নিশ্চয়ই সাদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে এবং মন্দ মৃত্যু দূর করে।

সুনান তিরমিযী- ৬৬৪

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (IIUSTB) পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।